সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

নভেম্বর ২০২৩

দীনবন্ধু মিত্রের সার্ধশত মৃত্যুবর্ষ

১ নভেম্বর ২০২৩-এ ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যৌথভাবে আখাউড়া-আগরতলা আন্তঃসীমান্ত রেল সংযোগ, খুলনা-মোংলা বন্দর রেললাইন ও মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের ইউনিট-২ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন, যা এই অঞ্চলে বিদ্যুৎ ও রেল কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি করবে।

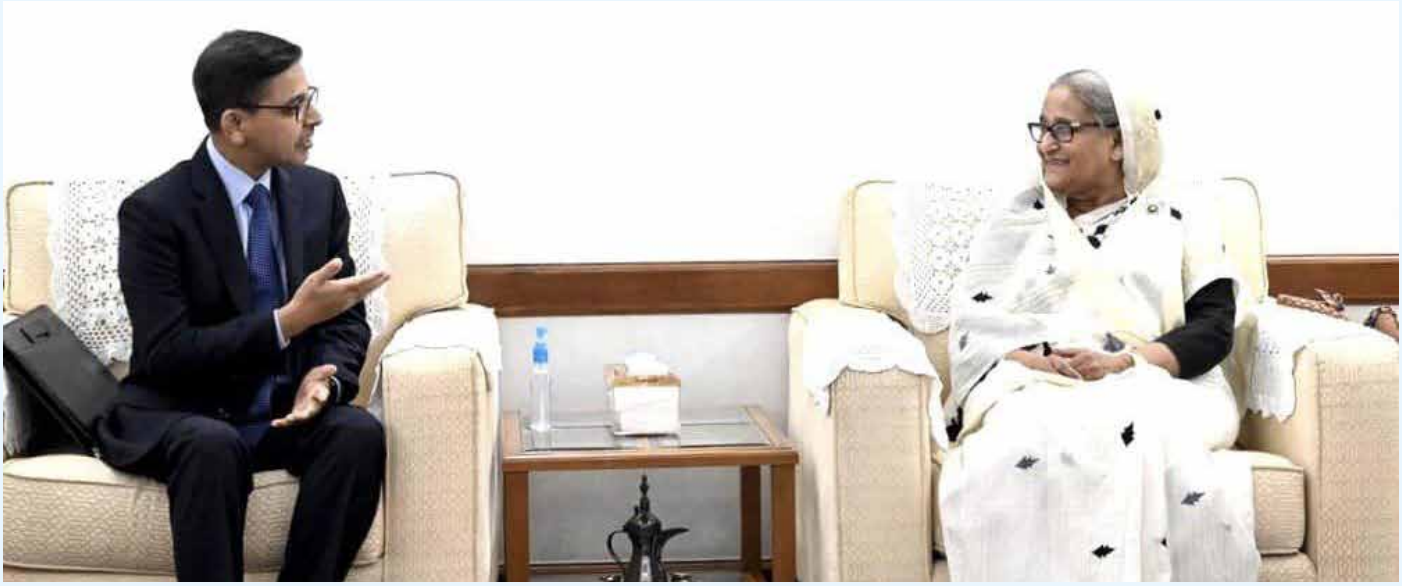

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ৩ নভেম্বর ২০২৩-এ ঢাকার গণভবনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার বহুমুখী সহযোগিতার সাম্প্রতিক অগ্রগতির বিষয়ে অবহিত করেন, যার মধ্যে ভারত সরকারের সহায়তায় বাংলাদেশে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহও রয়েছে।

১৭ নভেম্বর ২০২৩-এ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কর্তৃক আয়োজিত ২য় ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিটে যোগদান করেন।

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৫১ | সংখ্যা ১১ | কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩০ | নভেম্বর ২০২৩

High Commission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

অরবিন্দ চক্রবর্তী
সম্পাদক
ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স : ১১৪২
মোবাইল : +৮৮০১৮৫২০৪৬০২৮
e-mail : inf2.dhaka@mea.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

গ্রাফিকস শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা
মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড ৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত
ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত
লেখকের নিজস্ব। এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো যোগ নেই।
এ পত্রিকার কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়।

কেন্দ্রবিন্দু
উত্তরাখণ্ড

উত্তরাখণ্ড রাজ্যকে ডাকা হয় 'দেবভূমি'। সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এই রাজ্যে দেবতারা বসবাস করেন। সেই কারণেই এই রাজ্যকে নিজের হাতে যত্ন নিয়ে সাজিয়েছে প্রকৃতি। পাহাড়ঘেরা এই রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব।

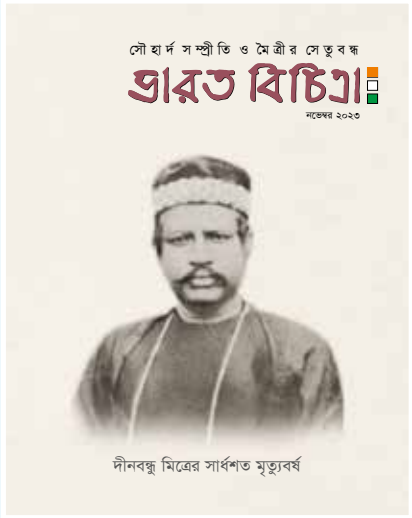

সূচিপত্র

প্রবন্ধ — প্যারীচাঁদ মিত্র : ফিরে দেখা ॥ বিশ্বজিৎ ঘোষ ০৩
নীরদ সি. চৌধুরী এক 'অজ্ঞাত ভারতবাসীর' গল্প
ড. রাশিদ আসকারী ০৭
অমর্ত্য সেনের আত্মজীবনীতে বাংলাদেশের স্মৃতি ॥ কামরুল আহসান ০৮
সার্ধশত মৃত্যুবর্ষ — দীনবন্ধু মিত্রের গল্পভাষা ॥ মামুন রশীদ ১২
সাক্ষাৎকার — আমরা রাস্তাঘাটে যতটা চিৎকার করেছি শিল্পে ততটা কনসেন্ট্রেট করিনি ॥ রামেন্দু মজুমদার
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : অপু মেহেদী ১৪
অনূদিত গল্প — মোগরা ফুল ॥ নমিতা দাস
অনুবাদ : মুহসীন মোসাদ্দেক ১৯
চলচ্চিত্র — প্রথাবিরোধী চলচ্চিত্রকার বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শৈবাল চৌধুরী ২২
পঙ্‌ক্তিমালা — ব্রতী মুখোপাধ্যায় ॥ শংকর চক্রবর্তী ॥ অঞ্জনা সাহা
কামরুল ইসলাম ॥ জ্যোতি পোদ্দার ॥ মাসুদার রহমান
বিনয় কর্মকার ॥ ফিরোজ আহমেদ ॥ মনিরুজ্জামান মিন্টু
পাপড়ি গুহ নিয়োগী ॥ অরবিন্দ চক্রবর্তী ॥ সুমন শাম্‌স
অমিত সাহা ॥ কুমকুম দত্ত ॥ রাজেশ চন্দ্র দেবনাথ
নীলাদ্রি দেব ॥ এস এম কাইয়ুম ২৪-২৬
ধারাবাহিক উপন্যাস — বহ্নিলতা ॥ অমর মিত্র ২৭
ছোটগল্প — বাড়ি ॥ মণীশ রায় ৩০
ভ্রমণ — ভুবনেশ্বরে আনন্দময় দিন ॥ প্রণব মজুমদার ৩৩
ইতিহাস — ভূমিপুত্র বিজয় সিংহ
বিস্মৃতির অতলে বাঙালি বীর ॥ জ্যোতির্ময় সাহা ৩৬
কেন্দ্রবিন্দু — উত্তরাখণ্ড ॥ রিফাত আরা ৪০
লোকশিল্প — বীরভূমের পটশিল্প ও পটসংগীত ॥ সেখ একরামুল হোসেন ৪৪
শেষ পাতা — শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ধর্মগুরু নানক ॥ সাদী মোহাম্মদ ৪৮

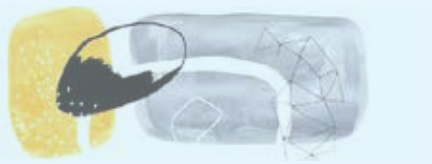

সম্পাদকীয়

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাটকের অন্যতম রূপকার হিসেবে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। বাংলা আধুনিক নাট্যধারার অন্যতম প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমসাময়িক হয়েও দীনবন্ধু মিত্র মাইকেল প্রবর্তিত পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাট্যরচনার পথে না গিয়ে বাস্তবধর্মী সামাজিক নাটক রচনায় নিজেকে নিবিষ্ট করেন। পরবর্তীতে কালের ধারায় তিনিই হয়ে ওঠেন নাট্যকারদের আদর্শ স্থানীয়।

১৮৬০ সালে ঢাকা থেকে দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়। তার সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'নীলদর্পণ' বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে পরিচিত। স্বাদেশিকতা, নীল বিদ্রোহ ও সমসাময়িক বাংলার সমাজব্যবস্থা এই নাটকের মূল উপজীব্য। এই নাটকের জন্যই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও রায়তদের মধ্যে মৈত্রীর সেতুবন্ধন স্থাপিত হয়, এর মধ্য দিয়েই শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের বর্বর চরিত্রের কালো দিক উদ্ঘাটিত হয়। এর পরে ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয় তার দ্বিতীয় নাটক নবীন 'তপস্বিনী'। দীনবন্ধু মিত্রের উৎকৃষ্টমানের প্রহসন হলো 'সধবার একাদশী' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'। ইংরেজি জানা শিক্ষিত নবীনদের মদ্যপান ও বারবণিতাকে উপহাস করে লেখা প্রহসন 'সধবার একাদশী'। ১৮৭২ সালে তার তৃতীয় প্রহসন 'জামাই বারিক' প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয় তার সর্বশেষ নাটক 'কমলে কামিনী'। নাটক ছাড়া আরও দুখানি কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন : 'দ্বাদশ কবিতা' (১৮৭২) ও 'সুরধুনী কাব্য' (প্রথম ভাগ-১৮৭১ ও দ্বিতীয় ভাগ-১৮৭৬) নামে। এই তো সেদিনের কথা মঞ্চে জীবন ঘনিষ্ঠ নাটক দেখে একটা অপার শান্তির নিশ্বাস ফেলে আমরা ঘরে ফিরেছি। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন ধস নামতে শুরু করল আমাদের নাট্যজগতে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে নাট্যমঞ্চে এক নীরব পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল। আমরা ক্রমান্বয়ে দেখতে পেলাম জীবন বিবর্জিত, অপ্রাসঙ্গিক এবং হাস্যরসে ভরা কিছু নাটক গ্রাস করতে শুরু করেছে আমাদের নাট্যজগৎকে। সম্ভবত তখন থেকেই এক অশুভ কালো মেঘ এসে ঢেকে দিতে শুরু করেছিল আমাদের নাট্য আন্দোলনের উদ্ভাসিত সূর্যকে। বর্তমান সময়ে কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নাটক আর উঠে আসছে না বলে শোনা যায়। আমাদের নাট্যমঞ্চে কাল্পনিক কাহিনি স্থূল বক্তব্য, আর সুড়সুড়ি দিয়ে হাসানোর এক অদ্ভুত কৌতুক চলছে। ক্রমান্বয়েই মঞ্চ থেকে নিভে যাচ্ছে আলোকের শিল্পিত প্রদীপশিখা। প্রাসঙ্গিকতার এই সঙ্কটকালে নাট্যাঙ্গনে প্রয়োজন দীনবন্ধু মিত্রের মতো নাট্যকার। যার বুদ্ধিদীপ্ত নাটক একাধারে সমাজ সচেতনার কথা বলবে আবার মানুষকে খুশি করার জন্য হাস্যরসের ব্যঞ্জনাও রাখবে। কিন্তু দীনবন্ধুর মতো ব্যক্তিত্ব বারবার জন্মান না। তাই দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যুর দেড়শত বছর পরে শুধু নয় আজীবন তিনি প্রাসঙ্গিক হয়ে মানুষের মনে আসীন হয়ে থাকবেন।

বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাসের আলালের ঘরের দুলালের স্রষ্টা প্যারীচাঁদ মিত্র। এ উপন্যাসে প্যারীচাঁদ প্রথম বারের মতো বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত গদ্যরীতির বাইরে গিয়ে চলিত ভাষারীতি প্রয়োগ করেন। সাধারণ মানুষের মুখের কথ্য ভাষা আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন করে। প্যারীচাঁদ মিত্রের ব্যবহৃত এই উপন্যাসের ভাষা পরবর্তীতে 'আলালী ভাষা' নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। তিনি একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। বিধবা বিবাহের প্রচলনের পক্ষে এবং বহু বিবাহের বিপক্ষে দৃঢ় অবস্থানে ছিলেন। তিনি নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য বহু উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং নারীদের জন্য পত্রিকা বের করেন। সাহিত্যের পাশাপাশি তার কর্মজীবনও ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ীর মতো আলোকিত মানুষের সান্নিধ্যও তিনি পেয়েছেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন বাংলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁস যুগের অন্যতম পথ প্রদর্শক।

বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক ও কবি। প্রথম সিনেমা 'সম্প্রদান' পরিচালনায় বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ষষ্ঠ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য নির্বাচিত হন ২০০০ সালে এবং তিনটি বিভাগে পুরস্কৃত হন। ২০০৩ সালে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘ (বিএফজেএ) বাপ্পাদিত্যকে বছরের সর্বাধিক আশাব্যঞ্জন পরিচালক হিসেবে পুরস্কৃত করে। তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য সিনেমা হলো : কাঁটাতার, কাল, হাউসফুল, কাগজের বউ, এলার চার অধ্যায়, নায়িকা সংবাদ, সোহরা ব্রিজ, দেবকী। বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত রচনাগুলোর মধ্যে 'পোকাদের আত্মীয়স্বজন' উল্লেখযোগ্য। তিনি চলচ্চিত্রবিষয়ক বেশকিছু গদ্যও লিখেছেন। বাংলা চলচ্চিত্রভুবনে নিজস্ব গল্প বলার রীতি, বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্রের সম্মিলন, লোকজীবনের সুর ও সংস্কার, গল্পের পরতে পরতে পরাবাস্তবতার ব্যঞ্জনার ব্যবহার-দক্ষতায় যখন ভিন্নমাত্রায় স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিলেন তখনই তাঁর মৃত্যু হয় ২০১৫ সালের ৭ নভেম্বর কলকাতায়, মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। তাঁর এই অকাল প্রয়াণ শিল্পজগতের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

প্রতিবারের মতো নিয়মিত বিভাগসমূহ থাকছে।

সকলের কল্যাণ হোক।

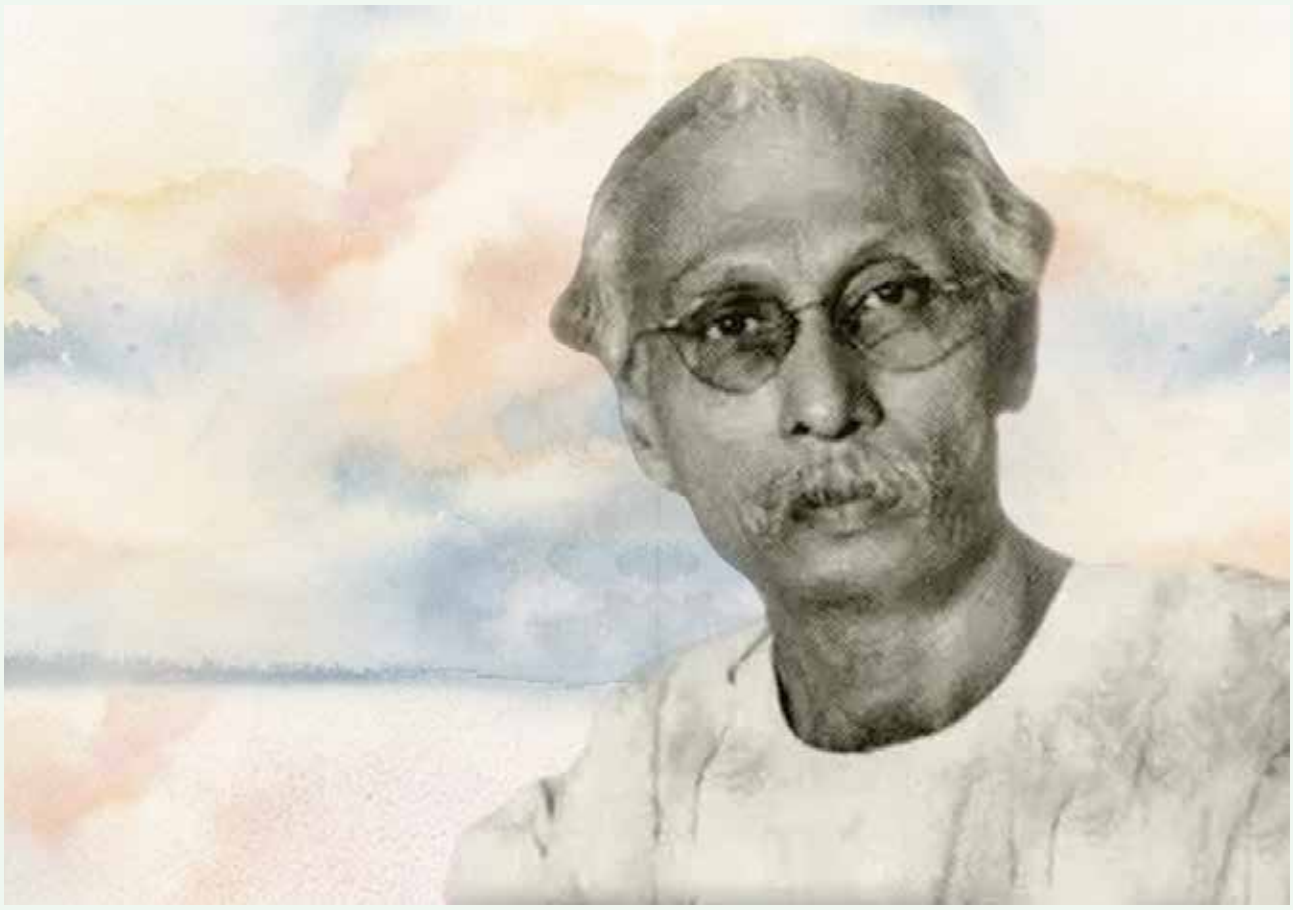

প্যারীচাঁদ মিত্র (২২ জুলাই, ১৮১৪–২৩ নভেম্বর, ১৮৮৩)

প্রবন্ধ

প্যারীচাঁদ মিত্র : ফিরে দেখা

বিশ্বজিৎ ঘোষ

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)। প্যারীচাঁদকে আমি স্রষ্টা এবং কর্মযোগী মানুষ হিসেবেই দেখতে ভালোবাসি। জন্মের পর দুশো বছর অতিক্রান্ত, মৃত্যুর পরও আমরা পেরিয়ে এসেছি একশো বত্রিশ বছর–তবু বাংলাভাষী মানুষের কাছে এখনো তিনি এক স্মরণীয় নাম। ভাষাবিদ্রোহী, সমাজনিষ্ঠ কথাকার, মানবউন্নয়ন সংগঠক, সাংবাদিক, অধ্যাত্মচিন্তক–কতভাবেই তো তাঁকে স্মরণ করতে পারি আমরা। দ্বিশততম জন্মবর্ষের একদশক সময় পেরিয়েও প্যারীচাঁদের কর্ম ও সাহিত্যসাধনা বিচার করতে বসলে, তাঁকে অনায়াসেই উন্মথিত উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলোকিত মানুষ হিসেবে শনাক্ত করা যাবে।

রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর 'ইয়ংবেঙ্গল'দের সমকালে বাংলাদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তাঁর সময় কেটেছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্যিক-সাহচর্যে। প্যারীচাঁদ মিত্র এমন এক সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন প্রগতিশীল চিন্তা, উদার মানবতাবাদী দর্শন, ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন এবং নাস্তিকতার পাশাপাশি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের দাপট,

সামাজিক অসঙ্গতি ও সনাতন মূল্যচেতনার যুগল স্রোতে বাংলাদেশের সমাজ ছিল গতিচঞ্চল, দ্বন্দ্বক্ষত এবং আসন্ন পরিবর্তনমুখী। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন প্যারীচাঁদ–ফলে তাঁর মানসলোকে উদার মানবতাবাদী চেতনা ও মুক্ত জীবনদৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল প্রথম যৌবনেই। ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন, সহকর্মী ছিলেন উনিশ শতকের আলোকিত মানুষ রামতনু লাহিড়ীর। বস্তুত, উনিশ শতকের 'সীমাবদ্ধ নবজাগরণের' সার্থক সব গুণই ক্রিয়াশীল ছিল প্যারীচাঁদের মানসলোকে।

শিক্ষা, সমাজ ও ব্যবসাসংক্রান্ত নানান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। ১৮৩৬ সালে হিন্দু কলেজের পাঠ সমাপ্ত করে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিতে সাব-লাইব্রেরিয়ান পদে যোগ দেন প্যারীচাঁদ। ১৮৩৯ সাল থেকে চাকরির পাশাপাশি ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়েন। বস্তুত, বিদ্যা ও বিত্তের সাধনার এক উজ্জ্বল উদাহরণ প্যারীচাঁদ মিত্র। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিতে কর্মনিষ্ঠার জন্য তিনি লাভ করেন আজীবন কিউরেটর ও কাউন্সিলরের পদ; অন্যদিকে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন উল্লেখযোগ্য অনেক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। 'কালাচাঁদ শেঠ এন্ড কোম্পানি'তে আমদানি-রপ্তানির কাজ করেন প্যারীচাঁদ, ছেলেদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'প্যারীচাঁদ মিত্র এন্ড সন্স' নামের কোম্পানি।

স্বাধীন বাণিজ্যে তাঁর সিদ্ধি রীতিমতো বিস্ময়কর। 'গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল কো. লি.', 'পোর্ট কানিং ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি', 'হাওড়া ডকিং কোম্পানি লিমিটেড'–এসব বিদেশি কোম্পানির পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্যারীচাঁদ। 'বেঙ্গল টি কোম্পানি', 'ডারা টি কোম্পানির লিমিটেড'–এসব সংস্থারও পরিচালক ছিলেন প্যারীচাঁদ।

উনিশ শতকে কলকাতার আলোকিত সমাজে প্যারীচাঁদ ছিলেন গতিশীল এক মানুষ। নানা কর্ম ও আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ সংযোগ। ১৮৩৮ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'দি সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ' নামের জ্ঞানচর্চার ব্যতিক্রমী এক প্রতিষ্ঠান। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী এই প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। 'দি বেঙ্গল বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'র (১৮৪৩) অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ। 'দি বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫১), 'বিটন সোসাইটি' (১৮৫১), 'দি ক্যালকাটা সোসাইটি ফর দি প্রিভেনশন অফ্ ক্রুয়েল্টি টু এনিম্যালস' (১৮৫১) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'দি বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন'-এর যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্যারীচাঁদ। ১৮২০ সালে কেরী-প্রতিষ্ঠিত 'এগ্রিকালচার এন্ড প্যারীচাঁদ হর্টিকালচার সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া'র সদস্য ছিলেন প্যারীচাঁদ। সদস্য হিসেবে এ সোসাইটির জার্নালে প্যারীচাঁদ কৃষি-বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। প্যারীচাঁদ-রচিত কৃষি-বিষয়ক মৌলিক ও অনূদিত রচনাসমূহ ভারতবর্ষে কৃষি-শিক্ষার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে উত্তরকালে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১৮৬০ সালে স্ত্রী বামাকালীর মৃত্যুর পর প্যারীচাঁদ প্রেততত্ত্ব তথা থিওসফির প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, প্যারীচাঁদের এই ভাষ্য : 'I become a theisist on a Brahma... In 1860, I lost my wife, which convulsed me much, I took to the study of spiritualism which, I confess, I whould not have thought of otherwise nor relished its charms (Peary Chand, 1881 : 9)'। তিনি সমমনাদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয় থিওসফিক্যাল সোসাইটি। দেশি-বিদেশি বহু থিওসফিকাল সংস্থার সঙ্গে প্যারীচাঁদের ছিল গভীর সম্পর্ক। ১৮৬০-উত্তর তাঁর সকল রচনাতেই থিওসফির প্রভাব পরিলক্ষিত।

২.

প্যারীচাঁদ মিত্রের কর্মজীবন যেমন বৈচিত্র্যমুখী, তেমনি তাঁর সাহিত্যজীবনও চমৎকারিত্ব আর বিদ্রোহে ঋদ্ধ। সাহিত্যকর্মের জন্যই উত্তরকালের বাঙালির কাছে তিনি সমধিক পরিচিত। টেকচাঁদ ঠাকুরের ছদ্মাবরণে প্যারীচাঁদ মিত্র সাহিত্যক্ষেত্রে যে সাহস ও দ্রোহের পরিচয় দিয়েছেন, উত্তরকালীন বাঙালি আজো কী তা যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে সচেষ্ট হয়েছে? সাহিত্যের বিষয় ও ভাষা, ভাবসম্পদ প্রকরণস্বাতন্ত্র্য–উভয় দৃষ্টিকোণেই প্যারীচাঁদের দ্রোহ মূল্যায়ন কিংবা পুনর্মূল্যায়নের দাবি রাখে।

একথা লেখার অপেক্ষা রাখে না যে, প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্যিক খ্যাতির প্রধান উৎস হচ্ছে 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)। তিনি লিখেছেন আরও সতেরোটি গ্রন্থ, কিন্তু এই একটি বই-ই বাঙালির কাছে তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। নানামাত্রিক বিতর্ক থাকলেও, 'আলালের ঘরের দুলাল'কেই বলা হয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রধান সব সমালোচকই 'আলালের ঘরের দুলাল'কে, সব সীমাবদ্ধতা আমলে নিয়েই, বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রসঙ্গত হ্যানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্স রচিত 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ' (১৮৫২) গ্রন্থের কথা উল্লেখ করতে হয়। একাধিক সমালোচক এ গ্রন্থটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে বিবেচনা করেছেন। কিছু উপন্যাসের কোনো শর্তই পূরণ করে না 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ'–এটি একান্তই খ্রিষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারক একটি রচনা মাত্র। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য সরোজ বন্দোপাধ্যায়ের মন্তব্য :

...ঔপন্যাসিকের মানসদৃষ্টি, বিস্তৃত জীবনপটে অভিজ্ঞতার বিন্যাস ও উপন্যাসোচিত সমস্যা–একটি উপন্যাসের এই প্রধান ত্রি-শর্তের একটিও এ পুস্তকে (করুণা ও ফুলমণির বিবরণ) রক্ষিত হয়নি... 'ফুলমণি ও করুণা'য় চরিত্রের কোনো বালাই নেই। নীতি-প্রচারকের সুমতি কুমতির গল্পের মতো এ গল্পে লেখিকার উদ্দেশ্যপোষক ভাবে যে কোনো ঘটনা যে-কোনোভাবে ঘটে। মানুষের মৃত্যুদৃশ্যও এ উপন্যাসে মানুষের মৃত্যুদৃশ্য না হয়ে খ্রীষ্টানের মৃত্যুদৃশ্য হয়ে উঠেছে। (সরোজ, ২০০৩ : ৫৭)

উপন্যাস হয়ে ওঠার সমুদয় শর্তই পূরণ করেছে 'আলালের ঘরের দুলাল'। উপন্যাসোচিত সমস্যা, দেশজ জীবনপট, মানুষ ও প্রকৃতির আন্তঃসম্পর্ক, রক্তমাংসময় চরিত্র, স্বকীয় ভাষা এবং লেখকের জীবনদৃষ্টি–উপন্যাসের এসব বৈশিষ্ট্যের সবটাই পাওয়া যাবে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ। এ উপন্যাসের শিল্পগুণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 'আলাল-এর প্রতিবেশ... পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল, জীবনের নানামুখীনতাকে অবলম্বন করিয়া রচিত। ইহাতে কেবল রাস্তাঘাটের কর্মব্যস্ততা ও সজীব চাঞ্চল্য নাই, আছে পারিবারিক জীবনের শান্ত ও দৃঢ়মূল কেন্দ্রিকতা, আইন-আদালতের কৌতূহলপূর্ণ কার্যপ্রণালী, নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজশাসনের যে সুকল্পিত বহির্ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ব্যক্তিজীবনের গতিচ্ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আনিতেছে তাহার সম্পূর্ণ চিত্র। চরিত্রাঙ্কনে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব আরও সুপ্রকট। মানুষ যে ঘটনাপ্রবাহে ভাসমান খড়কুটামাত্র নয়, তাহার ব্যক্তিত্ব যে নদীতরঙ্গ-প্রহত পর্বতের ন্যায় কম্পিত হইলেও স্থানভ্রষ্ট হয় না–ইহাতে চরিত্র-চিত্রণের এই আদর্শই অনুসৃত হইয়াছে (শ্রীকুমার, ১৯৯৬ : ২৯)।

'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের নায়ক মতিলালের আখ্যান সমকালীন জীবনের বহুমাত্রিক সমস্যা শিল্পিতা পেয়েছে, যাকে আমরা উপন্যাসোচিত সমস্যা হিসেবেই বিবেচনা করব। মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে মানবজীবন যে বিপন্ন হয়, একথাটাই বলতে চেয়েছেন প্যারীচাঁদ। এ সমস্যাটি উনিশ শতকের মধ্যপাদে কলকাতা-জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছিল। প্যারীচাঁদ ধর্মের মানুষকে খুঁজতে চাননি, তিনি সম্মান করেছেন মানুষের ধর্মকে। উনিশ শতকের মানবময় চেতনার সঙ্গে এ বোধের নিবিড় সংযোগ উপলব্ধি করতে পারলেই প্যারীচাঁদের ঔপন্যাসিক–সাফল্য আবিষ্কার করা সম্ভব।

'আলালের ঘরের দুলাল'-এ প্যারীচাঁদ আমাদের পরির গল্প শোনাননি, শুনিয়েছেন দেশজ জীবনপটে বিস্তৃত রক্ত-মাংসময় মানুষের গল্প। মতিলাল, বরদা-বেণীবাবু, ঠকচাচা-ঠকচচী–এসব চরিত্র উনিশ শতকের দ্বন্দ্বময় সমাজের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছন : 'সমকালের জীবন সম্বন্ধে প্রবল স্পৃহা, এবং সেই জীবনের বহু ব্যত্যয়ে প্রবল বেদনায় 'আলালের ঘরের দুলালে'র জন্ম (সরোজ, ২০০৩ : ৬০)। ঔপন্যাসিকের ইতিবাচক জীবনার্থ এবং 'পরম মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি' 'আলাল'কে, বহুবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, শিল্প করে তুলেছে। ঠকচাচার কারুণ্য, ঠকচাচীর অসহায়তা কিংবা কাশির গঙ্গাতীরে প্রাচীন ভারতবর্ষের ছায়ায় মতিলালের আত্মোপলব্ধি–এ সমস্তই ঔপন্যাসিকের মানবচেতনার ভাষিক-প্রকাশ। প্রসঙ্গত স্মরণীয় উপন্যাসের

অন্তিম বাক্যটি : 'ঠকচাচী কোনো উপায় না দেখিয়া চুড়িওয়ালী হইয়া ভেটিয়ারি গান 'চুড়িয়ালের চুড়িয়া' গাইতে গাইতে গলি গলি ফিরিতে লাগিল।' কোনো ধরনের নীতিবাক্য দিয়ে 'আলালে'র সমাপ্তি ঘটেনি, বরং অনাসক্ত জীবনপ্রীতিই এর পরম ব্যঞ্জনা।

বাস্তবতা বোধ প্যারীচাঁদ মিত্রের ঔপন্যাসিক-প্রতিভার বিশিষ্ট লক্ষণ। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 'প্যারীচাঁদ ঊনবিংশ শতাব্দীর একমাত্র বাঙালি লেখক যিনি আকাঁড়া বাস্তবকে উপন্যাসে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন' (সরোজ, ২০০৩ : ৬১)। এটি যেমন প্যারীচাঁদের গুণ, তেমনি দোষেরও আকর। কেননা, অনেক স্থলেই বাস্তব বর্ণনা শিল্পিত হয়ে ওঠেনি 'আলালে', কখনো কখনো চরিত্র হয়ে উঠেছে টাইপ, উপন্যাস সংগঠনে, সচেতন পাঠকের চোখে ধরা পড়বে, কখনো ঘটেছে কেন্দ্রানুগ শক্তির নিয়ন্ত্রণহীনতা। এতসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, অখণ্ড সমাজদৃষ্টি আর মানবমুখীনতার কারণে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'কেই আমরা বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস হিসেবে শনাক্ত করতে চাই এবং বলতে চাই–'আলালের ঘরের দুলাল'ই-প্রথম 'আমাদের' উপন্যাস। বাঙালি হিসেবে আমাদের গৌরব হয় এই যে, উপনিবেশিত সমাজ-কাঠামোতে বেড়ে ওঠা প্যারীচাঁদ মিত্র ঔপনিবেশিক রূপকল্প (Form) অগ্রাহ্য করে নিজস্ব রীতিতে উপন্যাস লিখেছেন। উপনিবেশের শিক্ষায় বেড়ে-ওঠা সমালোচক তাই 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস মূল্যায়নে তেমন আগ্রহ দেখাননি, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক-বাহকদের কাছেও প্যারীচাঁদ মিত্র পাননি তেমন পাত্তা। অথচ, যেমন বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, 'আলালের ঘরের দুলাল'ই আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি সৃষ্টি। (বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৯০ : ৮৬৩)

সূচনাসূত্রেই ব্যক্ত হয়েছে যে, ১৮৬০ সালে স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্যারীচাঁদের মানসলোকে ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে অধ্যাত্মচেতনা প্রেতজ্ঞান। 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে যে সমাজনিষ্ঠা ও মানবচেতনার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছিল, ১৮৬০-উত্তর প্যারীচাঁদের রচনায় তা অবসিত হলো; পক্ষান্তরে সেখানে প্রধান হয়ে উঠল অধ্যাত্মচেতনা, পরাজাগতিকবোধ এবং পেত-তাত্ত্বিক জ্ঞান। প্যারীচাঁদের এই মানস-রূপান্তরের পতিফলন ঘটেছে 'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১), 'যৎ কিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮১)–এসব রচনায়। প্রসঙ্গত আমরা স্মরণ করব ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত প্যারীচাঁদের সমাজ ও সমকালনিষ্ট অন্য একটি রচনার কথা। 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়?' গ্রন্থে প্যারীচাঁদ সমকালীন সমাজজীবনকে যেভাবে ধরতে চেয়েছিলেন, এক বছরের ব্যবধানে তার যে রূপান্তর ঘটল, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সমকালীন সমাজ-সংগঠনেই ছিল এই পশ্চাৎমুখী রূপান্তরের টান। রামতনু লাহিড়ী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু–কার মধ্যে ছিল না এই রূপান্তরের বাসনা? উপনিবেশের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে গড়ে ওঠা উনিশ শতকী নব-জাগরণের এই সীমাবদ্ধতাই কী প্যারীচাঁদের মানস-রূপান্তরের মৌল কারণ? সব সমালোচকই প্যারীচাঁদের স্ত্রী-বিয়োগজনিত বেদনার কথা বলেছেন। আমাদের মনে হয় বামাকালীর মৃত্যু আপাত কারণ হলেও, মৌল কারণ ক্রিয়াশীল ছিল 'ভিখিরির মাথায় জড়ি- জহরত দেওয়া পাগড়ির মতো' কিম্ভূতকিমাকার সমাজ সংগঠনে। সমাজ-সংগঠনের পশ্চাৎগতি প্যারীচাঁদের জীবনচেতনাকে দ্বিধান্বিত করেছিল এবং এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের ফলেই প্যারীচাঁদের সমাজময় বাস্তবতা রূপান্তরিত হলো অধ্যাত্ম-পরমার্থ চেতনায়।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসাধনার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ছিল পারীচাঁদের পরম অভীষ্ট (মনিরুজ্জামান, ১৯৬৮ : ২০)। 'গীতাঙ্কুর'-এর অনেক গানেই ইইজাগতিকতা-অতিক্রান্ত আত্মিক কল্যাণ ও অধ্যাত্মচেতনা পরিস্ফুট হয়েছে (বীণাপানি, ১৯৯৩ : ১১৩)।

'যৎকিঞ্চৎ', 'অভেদী' ও 'আধ্যাত্মিকা' রচনাত্রয় অধ্যাত্মচেতনা ও ঈশ্বরজ্ঞানে মুখর–এসব রচনায় প্যারীচাঁদ গভীর থিয়োসফিতে নিজেকে নিমগ্ন করেছেন। জীবনচেতনায় রূপান্তর সত্ত্বেও প্যারীচাঁদের এসব রচনায় রয়েছে ভিন্ন এক তাৎপর্য। সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির কথা আছে এসব রচনায়, উপ-নিবেশের সংস্কৃতি ও ধর্মের বিপ্রতীপে প্যারীচাঁদের এই অবস্থান তাঁর দ্রোহীমনের ভিন্ন এক প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা যায় কি? উপনিবেশিক সংস্কৃতিতে যুগ্ম-বৈপরীত্যের (Binary-opposition) ধারণায় প্রাচ্যের সবকিছু খারাপ–উপনিবেশিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এভাবেই কী প্যারীচাঁদ একটা শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন? প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দূরসঞ্চারী ইঙ্গিত :

প্যারীচাঁদের রূপক বা আধ্যাত্মিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে একক ও অদ্বিতীয়–কোন পরবর্তী ঔপন্যাসিক তাঁহার ধারার অনুবর্তন করেন নাই। তাঁহার মনোভাব যুগোচিত প্রগতিশীলতা ও সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিনিষ্ঠতার এক আশ্চর্য সমন্বয়। শ্রীকুমার, ১৯৯৬ : ২৯)

–হ্যানা কথারিন ম্যুলেন্স যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য কলম ধরেছিলেন, প্যারীচাঁদের প্রয়াস কী তার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ–এমন কথা কী ভাবা যায়?

৩.

উনিশ শতকের আলোকিত মানুষ ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি ছিলেন ডিরোজিওর ছাত্র, ছিলেন রামতনু লাহিড়ীর সহকর্মী। উনিশ শতকী 'সীমাবদ্ধ' নবজাগরণের অনেক গুণই প্যারীচাঁদের মানসগঠনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। প্রসঙ্গত সদর্থক ও ইতিবাচক নারীভাবনার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক দৃষ্টিকোণে নারীকে বিবেচনা করেননি, বরং তাঁর চেতনায় উঁকি দিয়েছিল সামাজিক জেন্ডার দৃষ্টিকোণে নারীকে মূল্যায়নের সদিচ্ছা। নারী-উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তিনি প্রকাশ করেছিলেন 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪)। পত্রিকার প্রতি সংখ্যার সূচনাতেই লেখা থাকত এই কথা :

এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। (উদ্ধৃত : বীণাপানি, ১৯৯৩ : ৭৬)

বাঙালি নারীসমজের মানসিক, নৈতিক ও পারিবারিক উৎকর্ষ সাধনে 'মাসিক পত্রিকা' পালন করেছে ঐতিহাসিক ভূমিকা। নারীসমাজের নানামাত্রিক উন্নতির জন্য 'মাসিক পত্রিকা'-য় প্যারীচাঁদ একের পর এক ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), এতদেশীয়, স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা (১৮৭৯), 'অভেদী' (১৮৭১), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), বামাতোষিমী (১৮৮১) ইত্যাদি রচনা।

প্যারীচাঁদ মিত্র বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন, ছিলেন বহুবিবাহের বিপক্ষে। তিনি মনে-প্রাণে প্রত্যাশা করছেন নারীর সামূহিক উন্নতি। বাংলা ভাষায় নারী-বিষয়ে গ্রন্থ রচনায়, তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। নারী-পুরুষের ভেদ তিনি মান্য করেননি; নারীকে তিনি করতে চেয়েছেন পুরুষ-নিরপেক্ষ। মানবাধিকার, সাম্য ও পরস্পর সহযোগ বাসনা প্যারীচাঁদের নারী-পুরুষ ভাবনার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়। বর্তমান সময়ে নারীবাদী ভাবনার যে প্রতিষ্ঠা, সার্ধশত বছর পূর্বেই প্যারীচাঁদের হাতে তার বীজ উপ্ত হয়েছিল–এ সূত্রেও তিনি স্মরণীয়।

৪.

সাংবাদিক হিসেবেও প্যারীচাঁদ মিত্র, সার্ধশত বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও, আজো স্বরণীয় এক নাম। ইতোপূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে, ১৮৫৪ সালে প্যারীচাঁদ নারী-উন্নয়নের বাসনা নিয়ে প্রকাশ করেছেন 'মাসিক পত্রিকা'। এ কাজে তাঁর নিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন রাধানাথ সিকদার। 'মাসিক পত্রিকা'র প্রতিটি সংখ্যায়, থাকত বারো পৃষ্ঠা। এই পত্রিকার রচনাসমূহ সাধারণ মানুষ বিশেষত নারীসমাজের বোধ্যগম ভাষায় রচিত হতো। 'মাসিক পত্রিকা'-র ভাষা প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য। সুকুমার সেন লিখেছেন :

'মাসিক পত্রিকা'-র ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্য এক অভিনবত্ব দেখাইল। কথ্যভাষার রীতিতে বাক্যরচনা, প্রচুর তদ্ভব এবং চলিত ফারসী শব্দের ব্যবহার, এবং ক্রিয়াপদে তৎসম ও চলিত পদের মিশ্রণ–ইহাই হইতেছে 'মাসিক পত্রিকা'-র রচনা-রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। (সুকুমার, ১৯৯৮ : ৬৩)

লেখ্য ও কথ্যরীতির শিল্পিত মিশ্রণই ছিল 'মাসিক পত্রিকা'য় প্রকাশিত রচনাগুচ্ছের প্রধান ভাষিক-বৈশিষ্ট্য। রাধানাথ সিকদার সহযোগী থাকলেও, পত্রিকার এই ভাষিক দর্শন প্যারীচাঁদ মিত্রের তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

'মাসিক পত্রিকা' ছাড়াও আরও কিছু পত্রিকার সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট

ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সপ্তাহিক 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১) পত্রিকার অন্যতম সাংবাদিক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। মাত্র পনেরো বছর বয়সেই প্যারীচাঁদ মিত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদকীয় লিখতে আরম্ভ করেন। প্যারীচাঁদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় কৃষি-বিষয়ক ক্ষণজীবী পত্রিকা 'Agriculture in Bengal' (১৮৮১)। বাংলাদেশে কৃষিক্ষিার ইতিহাসে এ পত্রিকার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। 'Agriculture in Bengal' পত্রিকায় কৃষি বিষয়ে প্যারীচাঁদ অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, যা সংকলিত হয়েছে তাঁর 'Agriculture in Bengal' (১৮৮১) শীর্ষক গ্রন্থে। এখানে উল্লেখ করা যায়, কৃষি-বিষয়ক তাঁর আরও একটি গ্রন্থ রয়েছে, যার নাম 'কৃষি পাঠ' (১৮৬১)। কর্নেল ওলকট এবং মাদাম ব্লাভাটস্কি সম্পাদিত 'Theosophist' (১৮৭৯) পত্রিকার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র।

৫.

বাংলা রচনার পাশাপাশি প্যারীচাঁদের ইংরেজি রচনার কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করি। ইংরেজি ভাষায় প্যারীচাঁদ রচনা করেন আটটি গ্রন্থ। এ ছাড়াও অগ্রন্থিত অবস্থায় রয়েছে তাঁর অনেক ইংরেজি রচনা। প্যারীচাঁদের ইংরেজি রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'A Biographical Sketch of David Hare' (1877), 'Stray Thoughts on Spiritualism' (1880), 'Life of Dewan Ramesmul Sen' (1880), — On the Soul : Its Nature and Development (1881), 'Agriculture in Bengal' (1881) ইত্যাদি। এসব গ্রন্থে এবং অগ্রন্থিত ইংরেজি রচনায় প্যারীচাঁদ ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, ধর্ম, বাঙালি নারীর আত্মিক জাগরণ, বাংলার অর্থনীতি এবং কৃষি-বিষয়ক নানামাত্রিক বিবেচনা উপস্থাপন করেছেন। ইংরেজি রচনার প্যারীচাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ, শিল্পীসুলভ এবং গভীর অনুসন্ধিৎসু (বীণাপানি, ১৯৯৩ : ১৫৭)।

ইংরেজি রচনাসমূহ পাঠ করলে অনুধাবন করা সম্ভব প্যারীচাঁদের অধ্যয়ন-বাপ্তি, তর্থনির্ভরতা, তত্ত্বজ্ঞান এবং মননচর্চার বহুমাত্রিকতা। প্যারীচাঁদ মিত্রের ইংরেজি রচনাসমূহ নিয়ে বিস্তৃত গবেষণার অবকাশ আছে বলে আমাদের মনে হয়েছে।

৬.

কর্মনিষ্ঠ ও সাহিত্যসাধকের পর এবার পরিচয় নেওয়া যাক ভাষাদ্রোহী প্যারীচাঁদ মিত্রের। বস্তুত, উত্তরকালীন বাঙালির কাছে সাহিত্যশিল্পী প্যারীচাঁদ নন, বরং ভাষাশিল্পী প্যারীচাঁদই সমধিক স্মরণীয়। প্রাক-প্যারীচাঁদ বাংলা গদ্য লৌকিক বাংলাকে অগ্রাহ্য করেছে, সাহিত্য-রচনায় গ্রহণ করা হয়নি লোকজীবনের কথ্যভাষা। ঈশরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত সংস্কৃতানুসারী বাংলা ভাষাকে খানিকটা সহজবোধ্য করলেও, তাঁদের রচনায় মান্য হয়নি বাঙালির লোকভাষা। সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃত ভাষার শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের জন্য বাংলা সাহিত্য এবং সাহিত্যের ভাষাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে প্যারীচাঁদ মিত্রের আবির্ভাব পর্যন্ত। বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষার শৃঙ্খল থেকে বাংলা সাহিত্যিক ভাষাকে প্রথম উদ্ধার করেন প্যারীচাঁদ মিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালি কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থ এই উভয় উদ্দেশ সিদ্ধ হইল। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে'র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে আর কোনো বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা সন্দেহ।

(বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৯০ : ৮৬৩)

–স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন একথা লিখেছেন, তখন প্রকাশিত হয়ে গেছে তাঁর অনেক উল্লেখযোগ্য রচনা। নিজে সংস্কৃতানুসারী গদ্য লিখলেও, 'আলালের' ভাষাকেই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-রচনার ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : 'আমি এমন বলিতেছি না যে 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি অল্প ভাব সফল, সকল সময়ে, পরিস্ফুট করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্ব্বজন-হৃদয়-গ্রহিতা সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ' (বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৯০ : ৮৬৩)।

উন্মথিত উনিশ শতকের গদ্যময় বাস্তবতা নির্মাণ প্যারীচাঁদের ভাষা রীতিমতো এক বিদ্রোহ। তাঁর পূর্বের, এমনকি পরবর্তীকালের লেখকবৃন্দও উপনিবেশ-সৃষ্ট জনবিচ্ছিন্ন ভাষাতে সাহিত্যচর্চা করেছেন। বাস্তব-অভিজ্ঞতার তলের সঙ্গে কোনো সঙ্গতি না রেখেই বলা যায় বাস্তব-নিরপেক্ষভাবে–তৈরি হচ্ছিল কথা, রচিত হচ্ছিল সাহিত্য। দেবেশ রায় একে বলেছেন 'অনুবাদ গদ্য'। তিনি লিখেছেন : 'একটি ভাষা তৈরি হচ্ছে যার প্রাথমিক ব্যবহার ঘটেছে অনুবাদে–ভাষার অনুবাদে নয়–বর্তমান অভিজ্ঞতার অনুবাদ, ইতিহাসের ব্যাখ্যার অনুবাদ, আর এই দুইয়ের মিশ্রণে চৈতন্যের অনুবাদ (দেবেশ, ১৯৯০ : ৬৯)। নতুন গদ্য জন্মলগ্নেই আক্রান্ত হয়েছিল জীবনবিচ্ছিন্নতার বীজাণুতে (আজম, ২০১৪ : ১৮৩)। ভাষিক এই জনবিচ্ছিন্নতার বীজাণুর বিরুদ্ধেই ছিল প্যারীচাঁদের বিদ্রোহ। 'আলালে'র ভাষা দিয়ে ঔপনিবেশিক ভাষিক-কাঠামোকেই আঘাত করেছিলন প্যারীচাঁদ। সাধুভাষার বিপরীতে 'অপর ভাষা'কে সাহিত্যের আসরে স্থান দিয়ে উত্তরকালীন বাঙালি লেখকদের কাছে প্যারীচাঁদ রেখে গেছেন অপার সাহসের উৎস। বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেই ছিল প্যারীচাঁদের যুদ্ধ। বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াকে ধাক্কা দিয়েছিলেন প্যারীচাঁদ। এখানেই বোধ করি সাহিত্যসাধক এবং ভাষা-সংগ্রামী হিসেবে পারীচাঁদের ঐতিহাসিক সার্থকতা।

৭.

উনিশ শতকের লেখক হলেও, প্যারীচাঁদ মিত্র বহুমাত্রিক কারণে এখনো আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতে পারেন। সাহিত্যের বিষয় ও ভাষা যে সমকালীন জীবন ও জনসাধারণের কথ্যভাষা থেকে গ্রহণ করা যায়–বাঙালি লেখককে তো একথা শিখিয়েছেন প্যারীচাঁদ মিত্র। ভাষা ও সাহিত্যের উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ছিল তাঁর সংগ্রাম। তাই হালের উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণ করলে, আমরা আবিষ্কার করতে পারব এক নতুন প্যারীচাঁদকে।

গ্রন্থপঞ্জি

দেবেশ রায় : ১৯৯০, 'উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য', প্যাপিরাস, কলকাতা। বীনাপানি বাগচী : ১৯৯৩, 'প্যারীচাঁদ মিত্রের জীবন ও সমাজ ভাবনা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা। মোহাম্মদ আজম : ২০১৪, 'বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ,' আদর্শ, ঢাকা। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদক) : ১৯৬৮, 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী' (ভূমিকাংশ), কথাকলি, ঢাকা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ১৩৯০, 'বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী,' ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : ২০০৩, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। সুকুমার সেন : ১৯৯৮, 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৬, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,' মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। Peary Chand Mitra : 1881, 'On the Soul' Modern Publisher, Calcutta.

বিশ্বজিৎ ঘোষ
প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

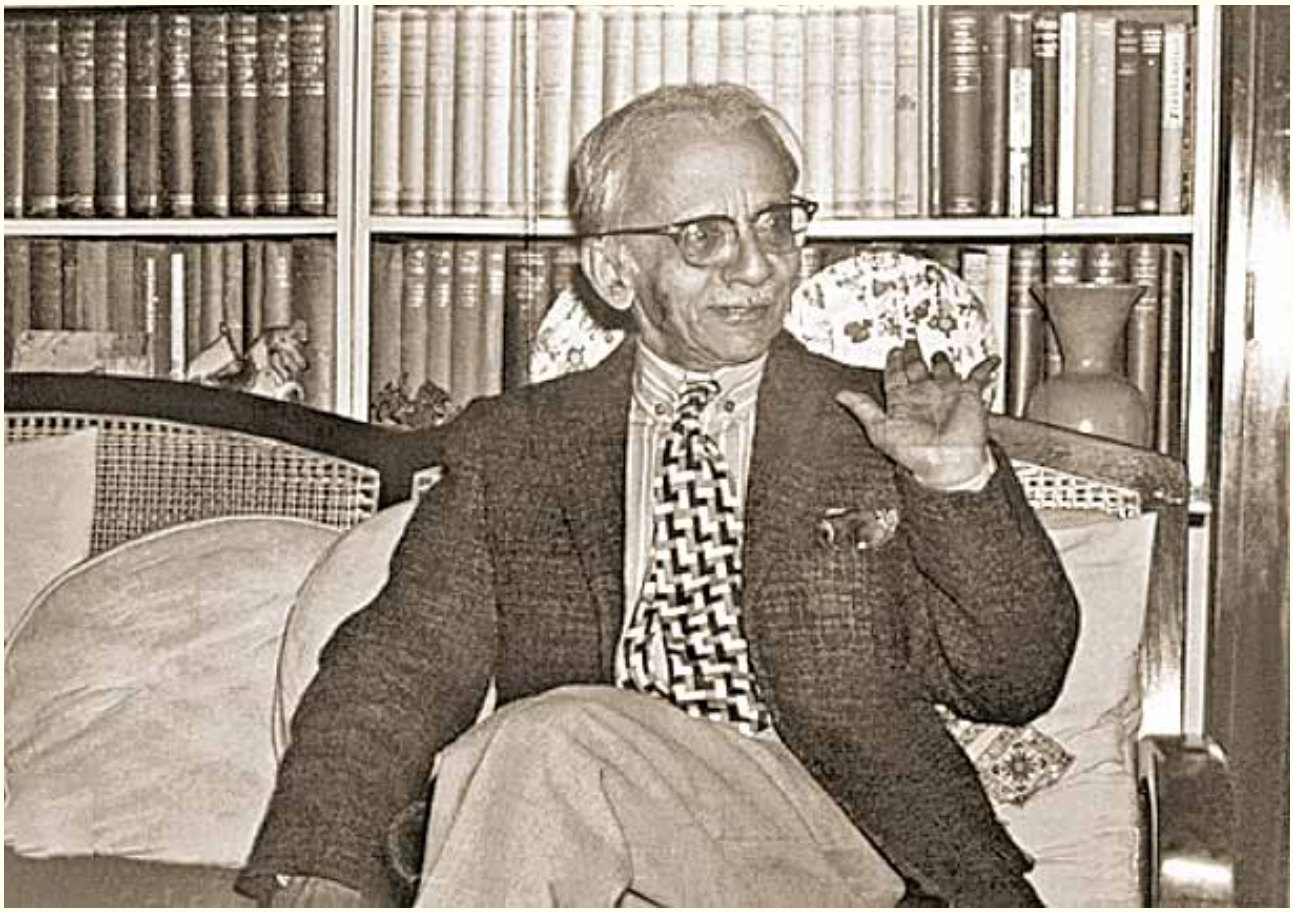

নীরদচন্দ্র চৌধুরী (২৩ নভেম্বর, ১৮৯৭ – ১ আগস্ট, ১৯৯৯)

প্রবন্ধ

নীরদ সি. চৌধুরী
এক ‘অজ্ঞাত ভারতবাসীর’ গল্প

ড. রাশিদ আসকারী

নীরদ সি. চৌধুরী কে ছিলেন? স্বঘোষিত ‘অজ্ঞাত ভারতবাসী’ নাকি মুলক রাজ আনন্দের ‘অদ্ভুত প্রতিভা’; সালমান রুশদির ‘দুষ্টু সত্তা’ নাকি পল ভার্গিসের ‘এক টুকরো সততা’; স্যার জন স্কয়ারের ‘ঋষি’ নাকি নটওয়ার সিং-এর ‘বৌদ্ধিক নরক’ কিংবা ‘পণ্ডিত সম্রাট’; এম. কে. নায়েকের ‘স্যুট-কোট-পরা ডাঁশ’, ‘জ্ঞানের হিমালয়’, ‘প্রতিমা চূর্ণকারী’, ‘ক্ষীণদৃষ্টি বিতর্কবিদ’, ‘বৈধর্ম্য ইতিহাসবিদ’, ‘ঘৃণ্য আত্মশ্লাঘী’, ‘হিজ ম্যাজেস্টিজ ইংলিশ মাস্টার’, ‘পাড় হিন্দু-বিদ্বেষী’ নাকি জুলফিকার ঘোষের ‘সম্পূর্ণ লেখক’, এডওয়ার্ড শিলসের ‘বিশ্ব নাগরিক’?’ অন্ধের হাতি দেখার মতো পণ্ডিতেরা নীরদ চৌধুরীর মূল্যায়নে মেতেছে। তবে তাঁর মতো এক প্রতিভার মূল্যায়নে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্তে লাফ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ, তাঁকে নিয়ে বিতর্কেরও যেমন শেষ নেই, তাঁকে মূল্যায়নেরও তেমনি কোনো ধ্রুব বাটখারা নেই

একদল যখন বলছে নীরদ সত্যভাষী যুধিষ্ঠির, তখন অন্যদল বলছে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল' কিংবা ব্যঙ্গ করছে 'বাদামী সাহেব'/ 'কৃষ্ণ সাহেব' বলে। তবে যে যাই বলুক না কেন, তাঁর তুঙ্গস্পর্শী লেখক খ্যাতিকে কেউই খাটো করে দেখার সাহস পাচ্ছে না। একজন নোবেল বিজয়ী লেখক উইন্সটন চার্চিল যখন বলেন, নীরদের আত্মজীবনী তাঁর সারাজীবনের পড়া সেরা দশটি বইয়ের একটি, তখন তাকে গুরুত্ব না দিয়ে আত্মজীবনীর উৎসর্গপত্র দেখে খিস্তিখেউড় করা কতটুকু গুরুত্ববহ তা সহজেই অনুমেয়। চৌধুরী যে অসামান্য কৃতী লেখক একথা স্বীকৃত সত্য। কিন্তু তিনি সমানভাবে বিতর্কিতও। তবে তাঁকে নিয়ে তর্কযুদ্ধ অনেকটা তিনি নিজেই সৃষ্টি করতেন বলে ধরে নেওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি একজন স্ব-স্বীকৃত বিতর্কপ্রবণ মানুষ ছিলেন, এবং জগৎ ও জীবন নিয়ে সর্বদা উত্তেজক মতামত রাখতে ভালোবাসতেন। তাঁর লেখা সমালোচকদের কাছে মিশ্র মূল্যায়ন পেয়েছে। যাইহোক, মূল বিষয় হলো লেখক হিসেবে তাঁর একটা বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করা। তার রচনাকর্মের উৎকর্ষ পরিমাপ করা। তবে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, চৌধুরীর মতামতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করা যায়, কিন্তু তাঁর সুবিশাল সাহিত্য-সৌধের গুরুত্বকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।

নীরদ সি. চৌধুরী (১৮৯৭-১৯৯৯) সম্ভবত বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘজীবী লেখক ছিলেন, যিনি তাঁর জীবনের শেষ বছর পর্যন্ত পূর্ণোদ্যমে লেখালিখি চালিয়ে গেছেন। দীর্ঘ জীবন এবং বিচিত্র জীবিকা তাঁর লেখাকে ইতিহাসবোধ, অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধিমত্তা এবং শিল্পময়তা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি ছিলেন একজন প্রথাবিরোধী লেখক, মৌলিক চিন্তাবিদ এবং ভিন্নধর্মী সামাজিক-রাজনৈতিক তাত্ত্বিক। তাঁর রচনা জন্মস্থান কিশোরগঞ্জ থেকে মৃত্যুস্থান অক্সফোর্ড পর্যন্ত; বাঙালি জীবন থেকে ব্রিটিশ-আমেরিকার রাজনীতি পর্যন্ত, ভারতীয় খাদ্য-পরিধেয় থেকে বিশ্ব সভ্যতার অলিগলি পর্যন্ত, সুদূরপ্রসারী বিষয় ও ভাবনাকে ধারণ করেছে।

চৌধুরী ছিলেন একজন অদম্য প্রতিভা এবং তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি সুশৃঙ্খল, পরিশীলিত, পরীক্ষিত এবং অর্থবহ জীবন যাপন করা, সক্রেটিস কিংবা প্লেটোরা যে জীবনের দীক্ষা দিয়ে গেছেন, (An unexamined life is not worth living.); যে জীবনে ইহজাগতিকতার নীতিগুলো অনুশীলন করা এবং পারলৌকিক জীবন নিয়ে দুশ্চিন্তা না করার দর্শন রয়েছে। ভারতীয় হিন্দু মন দীর্ঘকাল ধরে যে আলোআঁধারির (penumbra) ফাঁদে আটকা পড়ে আছে, নীরদ সে মনের এই ঘোর কাটাতে চেয়েছেন। বাঙালির এই জন্ম-জন্মান্তরের ঘোর রবীন্দ্রনাথও কাটাতে চাইতেন (সাত কোটি সন্তানেরে হে বঙ্গজননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি)। বস্তুত, নীরদ ছিলেন একজন নন-কনফর্মিস্ট। জীবন ও জগতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একজন আইকনোক্লাস্টের। বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক সততার তন্তু দিয়ে গঠিত তাঁর অদম্য শিল্পীমানস উনিশ শতকের বাঙালি সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রয়োজনীয় পুষ্টিলাভ করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্য হলো স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটার সাহস অর্জন এবং বাঙালি মধ্যবিত্তের চিরায়ত আপোষকামিতার নীতির বিরুদ্ধাচরণ করা। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁকে তাঁর প্রজন্মের সবচাইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বময় এবং প্রাতিস্বিক করে তুলেছে। সুবিশাল জনসমুদ্রে নীরদ যেন দূরের এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।

এটা মোটেও আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এই ধরনের একজন 'ভয়ংকর লেখক' স্বদেশিদের সমালোচনার চাবুকে ক্ষতবিক্ষত হবেন। তাঁর প্রথম বই দ্য অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান–এর প্রকাশের পর তাঁর ওপর যে পরিমাণ নিন্দার ঝড় উঠেছিল, তা কেবল সদ্যস্বাধীন ভারতের বুদ্ধিজীবী মহলকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। সংক্ষুব্ধদের সুদীর্ঘ তালিকায় প্রধানমন্ত্রী নেহরু পর্যন্ত ছিলেন। নীরদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার ধোঁয়া ওঠে। চারদিকে কাট কাট মার মার রব পড়ে যায়। পরে দেখা যায় যে, সারভেন্টিস-এর কৌতুক হিরো ডন কুইক্সোট যেমন বায়ুকল দেখে দানব ভেবে আক্রমণ করেছিল (দ্র. Tilt at windmills), নীরদের স্বদেশি সমালোচকেরা তেমনি তাঁর কথার গভীর অর্থ বুঝতে না পেরে তাঁর আত্মজীবনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হতে পারে, পোস্টস্ট্রাকচারালিস্টরা যাকে বলে 'উপস্থিতির অধিবিদ্যা' (Metaphysics of Presence), নীরদ-বিদূষকেরা তার দ্বারা তাড়িত হয়েছিলেন। তাঁর 'ব্রিটিশতোষক' কিংবা 'ভারতবিদ্বেষী' হওয়ার ধারণাটিও তেমনি আপাতদৃষ্টে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। ভাবনার গভীর কাঠামোয় এর ভিত্তি অনেক দুর্বল।

চৌধুরী একজন প্রথাবিরোধী লেখক হিসেবে ভিন্ন ভাবনার উদ্রেক করাতেন। তবে তাঁর মতামত বরাবরই ছিল দৃষ্টিআকর্ষক এবং ভাবোদ্রেকী। ভিক্টোরীয় ব্রিটিশ জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর সুখানুভূতি এবং আধুনিক ভারতীয় জীবনধারার প্রতি বিবমিষা তাঁর অপ্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। ইঙ্গবাতিকগ্রস্ততা কিংবা স্বদেশ-বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ নয়। তবে তিনি ইংল্যান্ডের অন্ধ ভক্ত ছিলেন না, ভারতবিদ্বেষীও ছিলেন না। বরং, তিনি একজন প্রকৃত অ্যাংলোফাইল এবং একজন সত্যান্বেষী ভারতীয় ছিলেন। এটি একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ যে তিনি একজন নিস্পৃহ সমাজব্যাখ্যাতা এবং একই সঙ্গে একজন স্বেচ্ছাচারী সমালোচক ছিলেন। 'অ্যাংলোম্যানিয়াক চৌধুরী' বা 'ভারতবিদ্বেষী চৌধুরী' তাঁর কাজের একটি অংশের চরমপন্থি মূল্যায়ন। তাঁর কাজের সামগ্রিকতার বিচারে এই রায় সর্বদাই পুনর্বিচারের দাবি রাখে। বস্তুত, চৌধুরী যতদূর সম্ভব চেষ্টা করেছিলেন, একটি বিষয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নির্মোহ রাখার। বস্তুনিষ্ঠ এবং তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি তাঁর ভাবনা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। এসকল বিষয় তাঁকে সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে একজন লেখক হিসেবে স্বকীয়তা ও সামর্থ্য প্রকাশ করতে এবং জীবন দর্শন প্রণয়ন করতে সাহায্য করেছে।

অতএব, চৌধুরী সমালোচকদের দায়িত্ব হলো অ্যাংলোফাইল এবং অ্যাংলোম্যানিয়াকের মধ্যে পার্থক্য আঁকা। যে দুটি অভিধা চৌধুরীর বৈচিত্র্যপূর্ণ লেখকসত্তা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, তার একটিও প্রশ্নহীন নয়। চৌধুরীর অ্যাংলোফিলিজম এক ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের প্রতি নিছক এক স্মৃতিকাতরতা নয়, কিংবা অধুনা শূন্যগর্ভ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরববন্দনা নয়। বরং এটি ছিল এমনি এক সুবিবেচিত এবং আলোকিত প্রক্রিয়া যা নীরদ তাঁর বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা আর বিচারবোধ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি ব্রিটিশ জীবন ও সংস্কৃতির কেবল সেই দিকগুলোর প্রশংসা করেন, যা প্রশংসার যোগ্য। ব্রিটিশ জনগণকে তাদের ঔপনিবেশিক বর্বরতা এবং ভারতীয়দের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণের জন্য তিরস্কার করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। ভারতে ব্রিটিশ জনগণের নিষ্ঠুরতার অনেক দালিলিক প্রমাণ তিনি দিয়েছেন, যেমন গণনির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যা এবং গণহত্যার পাশাপাশি তাদের সম্মিলিত বর্বরতা, ব্যক্তিগত কাপুরুষতা, নৈতিক অবক্ষয়, যৌন বিকৃতি, সীমাহীন মদ্যপান প্রভৃতি। আজকের ইংরেজদের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে তিনি এমন চরমে পৌঁছেছিলেন যে নিঃসংকোচে বর্তমান ব্রিটেনকে 'একটি দুর্নীতিগ্রস্ত সভ্যতা' (a corrupt civilization) বলে অভিহিত করেছিলেন। নীরদের মধ্যে যে ইঙ্গস্তাবকতার লক্ষণ পাওয়া যায়, তা মূলত হারিয়ে যাওয়া ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের জন্যে শোকস্মৃতিবিধুরতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

চৌধুরী যেভাবে ব্রিটিশ লেগাসির বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন, তা অবশ্যই উত্তর-ঔপনিবেশিক লেখকরা যেভাবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 'রাইট ব্যাক' করে, তার মতো নয়। উত্তর-ঔপনিবেশিকতার প্রধান সূত্র (The empire writes back) মতে, উত্তর-ঔপনিবেশিক লেখকরা সাম্রাজ্যবাদী সাংস্কৃতিক জ্ঞানের দীর্ঘবাহিত আধিপত্যকে অস্বীকার করে। তারা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে উদ্ভূত এবং স্ব-নিয়ন্ত্রণ অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের ভূমি এবং উত্তরাধিকারের ওপর আপন সাংস্কৃতিক সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য সংগ্রাম করছে। সুতরাং, তাদের লেখা সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি এবং দেশীয় সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয় এবং ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের প্রতি কঠোর সমালোচনামূলক আর শ্রদ্ধাহীন হয়ে ওঠে। চৌধুরীও, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে উদ্ভূত একটি দেশের মানুষ ও সংস্কৃতির বাতাবরণ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁর লেখাও ইন্দো-ব্রিটিশ সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়া থেকে নিঃসৃত হয়েছে। উপরন্তু, তিনিও ব্রিটেনের জনগণ এবং সংস্কৃতির একটি সচেতন সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন নানাভাবেই। তবুও তাঁকে উত্তর-ঔপনিবেশিক লেখকদের সারণিতে অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত কি না, তা নিয়ে বিতর্ক আছে।

চৌধুরীর লেখাতেও প্রথাগত উত্তর-ঔপনিবেশিকদের থেকে ভিন্ন এক ধরনের উত্তর-ঔপনিবেশিক আন্ডারটোন রয়েছে। প্রফেসর ইয়ান আলমন্ড তাঁকে যথার্থই বলেছেন 'একজন উত্তর-ঔপনিবেশিক রক্ষণশীল' (a post-colonial conservative)। অমিত চৌধুরী

চৌধুরী একজন প্রথাবিরোধী লেখক হিসেবে ভিন্ন ভাবনার উদ্রেক করাতেন। তবে তাঁর মতামত বরাবরই ছিল দৃষ্টিআকর্ষক এবং ভাবোদ্রেকী। ভিক্টোরীয় ব্রিটিশ জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর সুখানুভূতি এবং আধুনিক ভারতীয় জীবনধারার প্রতি বিবমিষা তাঁর অপ্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। ইঙ্গবাতিকগ্রস্ততা কিংবা স্বদেশ-বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ নয়। তবে তিনি ইংল্যান্ডের অন্ধ ভক্ত ছিলেন না, ভারতবিদ্বেষীও ছিলেন না। বরং, তিনি একজন প্রকৃত অ্যাংলোফাইল এবং একজন সত্যান্বেষী ভারতীয় ছিলেন। এটি একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ যে তিনি একজন নিস্পৃহ সমাজব্যাখ্যাতা এবং একই সঙ্গে একজন স্বেচ্ছাচারী সমালোচক ছিলেন

উত্তর-ঔপনিবেশিক লেখকদের সাধারণ তালিকায় নীরদ চৌধুরীকে কেন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয় তার কোনো কারণ খুঁজে পান না। তিনি নীরদ সি. চৌধুরীর মতো লেখকদের উপেক্ষা করার জন্য উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যকে অপেক্ষাকৃত কম সৃষ্টিশীল ও সমালোচনামূলক এবং অধিক রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন প্রকল্পে পরিণত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন। যদিও গায়ত্রী স্পিভাকের সতীদাহের শিকার মহিলারা, স্পিভাক যাদের সাবঅল্টার্ন বলেছেন, নিজেদের পক্ষে কথা বলতে পারে না, কিন্তু চৌধুরী, বিবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকায়ণের শিকার হয়েও, সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে উপনিবেশিত ভারতীয়দের পক্ষে কথা বলতে পেরেছেন (Civis Britanicus sum)। আত্মজীবনীর উৎসর্গপত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রজাস্বত্ব প্রদান এবং নাগরিকত্ব স্থগিতকরণের অভিযোগ উত্থাপন সালমান রুশদী কথিত 'রাইটিং ব্যাক'-এর নমুনা নয় কি? (To the memory of the British Empire in India, which conferred subjecthood upon us, but withheld citizenship. To which yet every one of us threw out the challenge : "Civis Britannicus sum". Because all that was good and living within us was made, shaped and quickened by the same British rule.) অধিকন্তু, চৌধুরীর লেখায় প্রখ্যাত উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবুক হোমি ভাভা নির্দেশিত উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রবণতা, যেমন সাংকর্য, অনুকরণ, ভেদাভেদ, দ্বান্দ্বিকতা এবং প্রতিরোধের অনেকগুলো উপাদান রয়েছে। চৌধুরীও নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে ঔপনিবেশিকতার অধ্যয়নকে পরিবর্তন করেছেন একেবারে নিজের মতো করে, এবং হোমি কে. ভাভা প্রস্তাবিত আন্ত-সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিষয়ে চৌধুরীর ভাবনারও পরিবর্তন ঘটেছে।

চৌধুরীর মধ্যে তাঁর স্বদেশি ভারতীয়দের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার একটি সুস্পষ্ট ইচ্ছা লক্ষ্যণীয়। এর কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে তাঁর স্বতন্ত্র পারিবারিক বাতাবরণ এবং প্রবল অধ্যয়নলব্ধ প্রাতিস্বিক বোধের ভেতরে। তাছাড়া, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাওয়াও এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী অনুভূতির জন্ম দিয়েছে। তাই, চৌধুরী, সারা জীবন, দেশে এবং বিদেশে সমাজের অন্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করেন এবং এডওয়ার্ড সাইদের 'নির্বাসিত বুদ্ধিজীবী'-এর মতো একজন নিঃসঙ্গ শেরপা, একজন কঠোর সমালোচক এবং অক্লান্ত ভিন্নমত পোষক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যিনি 'প্রচলিত যুক্তির প্রতি সাড়া দেন না... কর্তব্যকর্মে দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন এবং পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য, স্থির না থেকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।' [তৎপর থাকেন] (দ্র. Representations of Intellectuals, 1994)। চৌধুরীর স্ব-আরোপিত নির্বাসন তাঁকে তৈরি করেছিল, যেমন রিল্কে বলেছেন, 'বিদ্যমান পরিস্থিতির মধ্যেই তিনি শুরু করেন এক অপ্রচলিত জীবনশৈলী এবং সর্বোপরি, একটি ভিন্ন, প্রায়শই ভীষণ, উদ্ভট এক কর্মজীবন' (প্রাগুক্ত)। চৌধুরীর নিরন্তর স্থানচ্যুতি তাঁকে স্বাভাবিক কর্মজীবন থেকে মুক্ত করেছে। একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে তিনি যা করেছিলেন তা তাঁর নিজেকেই তৈরি করতে হয়েছিল, কারণ তিনি একটি পূর্বনির্ধারিত পথ অনুসরণ করতে পারেননি। অতএব, একজন প্রকৃত বুদ্ধিজীবী হিসেবে তিনি সর্বদাই একজন বহিরাগত, স্ব-আরোপিত নির্বাসনে এবং সমাজের প্রান্তে বসবাস করতেন। আমাদের কাছে তাঁর জ্ঞানের ঝংকার, পক্ষপাতদুষ্ট মতামত, উচ্ছৃঙ্খল অনুমান এবং খেয়ালি ধারণার রাশি রাশি উদাহরণ রয়েছে। তবুও, তাঁর কাজের সমস্যাব্যঞ্জক উপাদানগুলো তাঁর কৃতিত্বকে ম্লান করতে পারে না। দিনশেষে, একজন লেখক এবং একজন ব্যক্তিত্ব উভয় হিসেবেই তাঁর সামগ্রিক কৃতিত্বের যোগফল তাঁর উপযোগের পাল্লাকে ভারী করে। তিনিই সম্ভবত সমসাময়িক ভারতের একমাত্র প্রধান লেখক যিনি সমান স্বাচ্ছন্দ্য ও দক্ষতার সাথে দুটি ভাষায় লিখেছেন।

নীরদ সি. চৌধুরী, তাঁর সকল উৎকেন্দ্রিকতা এবং বাতিকগ্রস্ততা সত্ত্বেও, চূড়ান্ত বিচারে মানববিদ্বেষী ছিলেন না। তাঁর সরল স্বীকারোক্তি 'I am not a bad sort at bottom,'–মানুষের মনে অনুরণিত হয়। তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন এবং মানবতার একজন মহান কর্মী হিসেবে কাজ করার প্রয়াস পেয়েছেন। একজন মানবতাবাদী বিশ্ব-নাগরিক হিসেবে, এডওয়ার্ড সাঈদ কিংবা জুলিয়েন বেন্দার মডেল বুদ্ধিজীবীদের মতো চৌধুরী এক ধরনের সর্বজনীন মানবিক মানচিত্রের মধ্যে বিরাজমান থেকেছেন, যা জাতীয় সীমানা বা জাতিগত পরিচয় দ্বারা আবদ্ধ নয়, কিংবা জাতীয় এবং বৈশ্বিক উভয় নীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। তিনি একই সঙ্গে একজন খাঁটি বাঙালি এবং একজন প্রকৃত মানস ইংরেজ–উভয়ই ছিলেন, এবং এক বিরল এবং অভূতপূর্ব সমন্বয় প্রদর্শন করেছিলেন যা ভারতীয় এবং ব্রিটিশ উভয় সাংস্কৃতিক চেতনার এক নিখুঁত সংমিশ্রণ, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি অপূর্ব সংশ্লেষণ।

যদিও চৌধুরী এক স্বল্প-পঠিত এবং স্বল্প-অনুধাবিত লেখক, তবুও তিনি আমাদের সময়ের জন্যে প্রচণ্ড প্রাসঙ্গিকতার অধিকারী। একজন তাত্ত্বিক–চিন্তাবিদ হিসেবে তাঁর গুরুত্ব দক্ষিণ এশিয়া এবং তার বাইরের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেও উপলব্ধ হয়। সম্প্রতি পণ্ডিত, লেখক এবং পাঠকদের একটি নতুন প্রজন্ম অনেক আগ্রহ এবং গুরুত্বের সাথে চৌধুরীর রচনার মূল্যায়ন শুরু করেছে। বর্তমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিষয়টি তুমুলভাবে প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে যখন বিশ্ব মানবিক পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি হচ্ছে, কুসংস্কার, অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, গোঁড়ামি এবং ধর্মান্ধতার কারণে মানবজাতির অগ্রযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে চৌধুরীর লেখাগুলো অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ভাবনার ঢাল হয়ে দাঁড়ায়, এবং পাঠককে যুক্তিবাদী মানস, সমালোচনামূলক ভাবনা (Critical Thinking) গঠন এবং অনুশীলনে আমন্ত্রণ জানায়।

সর্বোপরি, ঔপনিবেশিক-উত্তর যুগে, যখন এক সময়ের উপনিবেশিত দেশগুলোর মানুষ তাদের আত্মপরিচয়, সাংস্কৃতিক শেকড় এবং ঐতিহ্যকে পুনঃআবিষ্কার করার তাগিদ অনুভব করছে, চৌধুরীর লেখাগুলো তখন আমাদের নিজেদের পরিস্থিতিকে আরও বিস্তৃত এবং গভীরতরভাবে বোঝার ক্ষেত্র বিনির্মাণে বিরাট অবদান রাখতে পারে। চৌধুরীর অপ্রথাগত ব্যাখ্যা, চতুর বিশ্লেষণ, এবং চমকপ্রদ সমালোচনা আমাদের সাংস্কৃতিক সচেতনতাকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করতে পারে এবং প্রচলিত বিশ্বাস, সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্টেরিওটাইপ এবং জনপ্রিয় মিথগুলোকে বাজেয়াপ্ত করতে অবদান রাখতে পারে। তাঁর লেখা কেবল ইন্দো-ইংরেজি মিথক্রিয়াতেই নয়, আমাদের 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এ বিরাজমান সামগ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক পরিস্থিতির একটি জানালা খুলে দেয়। চৌধুরীকে পাঠ করা মানে এক বুদ্ধিবৃত্তিক মহাবিশ্বের অভিযাত্রী হওয়া। •

ড. রাশিদ আসকারী
কলামিস্ট, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং প্রাক্তন উপাচার্য, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

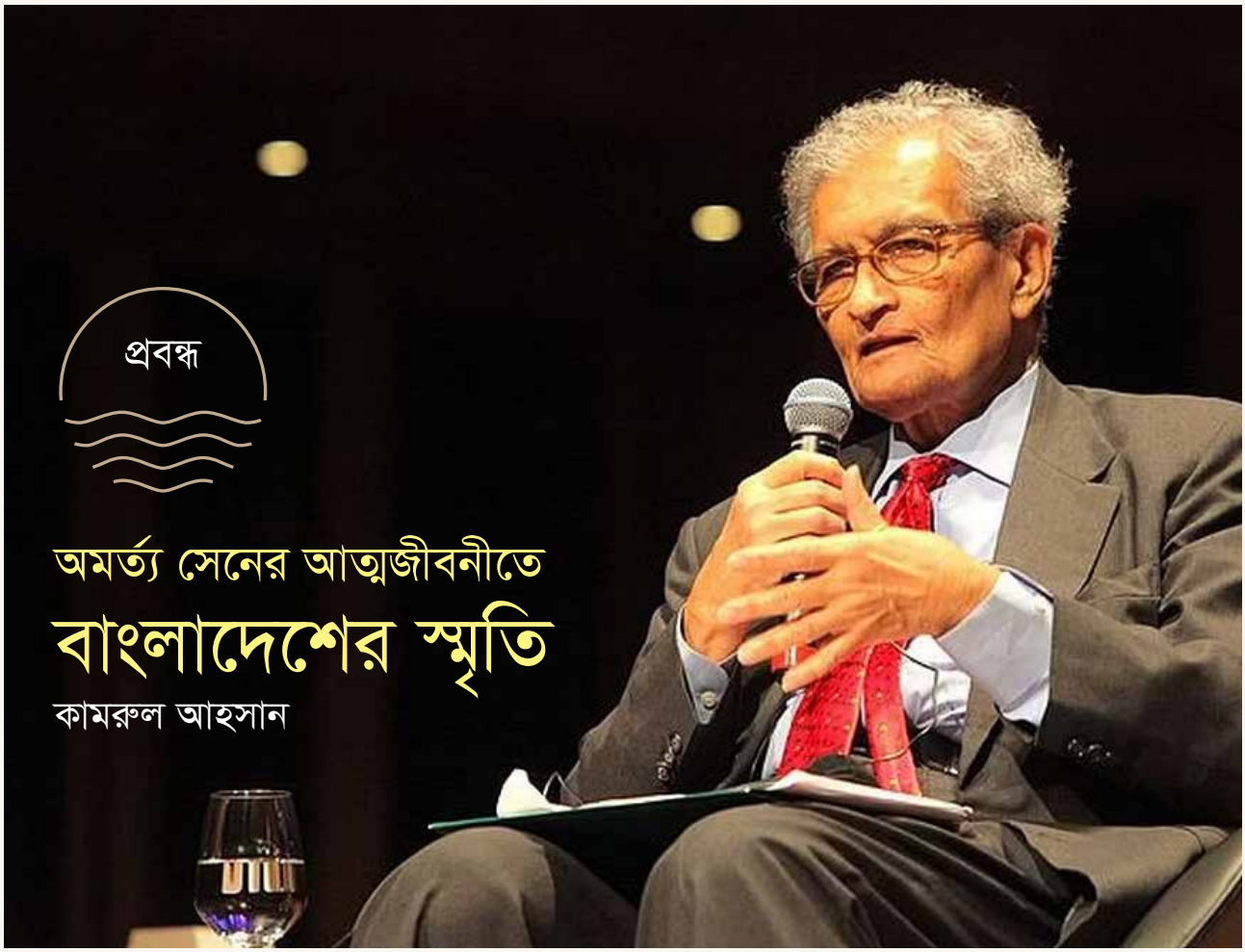

প্রবন্ধ

অমর্ত্য সেনের আত্মজীবনীতে বাংলাদেশের স্মৃতি

কামরুল আহসান

অমর্ত্য সেন (৩ নভেম্বর ১৯৩৩–)

বিবিসি থেকে অমর্ত্য সেনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার বাড়ি কোথায় বলে মনে করেন? অমর্ত্য সেন উত্তর দিয়েছিলেন, এখন তো তিনি এই ট্রিনিটি কলেজকেই নিজের বাড়ি বলে মনে করেন। এখানে এক সময় তিনি ছাত্র ছিলেন, আর এখন তিনি এখানের শিক্ষকও। পরেই তিনি যোগ করেন, হার্ভার্ড স্কোয়ারও তো আমার আরেক বাড়ি। আরও বলেন, ইন্ডিয়াকেও তো তিনি বাড়ি বলে মনে করেন, বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের সেই বাড়ি, যেখানে তিনি বেড়ে উঠেছেন, সময়-সুযোগ পেলেই যেখানে তিনি ফিরে ফিরে যান।

তাঁর কথায়, স্বভাবতই, প্রশ্নকর্তা একটু বিভ্রান্ত হয়ে যান। অমর্ত্য সেনও সেটা বুঝতে পারেন। বুঝতে পেরে একটু মুচকি হেসে বলেন, সত্যিই তো, কারো তো এমন নির্দিষ্ট একটা জায়গা থাকা দরকার, যাকে সে প্রকৃত বাড়ি বলে মনে করে।

কোথায় সেই বাড়ি?

সেই বাড়ির সন্ধান করতে গিয়ে অমর্ত্য সেনের মনে পড়ল জগৎ কুটিরের কথা। তাঁর ছেলেবেলার বাড়ি।

জগৎ কুটিরের অবস্থান পুরনো ঢাকার ওয়ারিতে। বাড়িটি বানিয়েছিলেন তাঁর দাদা সারদাপ্রসাদ সেন। বাড়িটি নামকরণ করা হয়েছে সারদাপ্রসাদ সেনের স্ত্রী জগৎলক্ষ্মীর স্মৃতিরক্ষায়। অমর্ত্য সেনের জন্মের বহু আগেই তিনি জগৎসংসার ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু, সেই ছেলেবেলা থেকেই অমর্ত্য সেন তার ঠাকুরমার স্মৃতি বহন করে চলেছেন। মানুষটি না থাকলেও বাড়িটিতে তার স্মৃতির প্রভাব রয়ে গিয়েছিল নানাভাবে।

অমর্ত্য সেনের জন্মের সময় তাঁর পিতা আশুতোষ সেন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক। আর তাঁর দাদা সারদাপ্রসাদ সেন ছিলেন ঢাকা কোর্টের বিচারপতি। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষেরও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

অমর্ত্য সেনের জন্ম হয়েছে অবশ্য কলকাতায়। শান্তিনিকেতনে। মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেনের 'পর্ণকুটীরে'। ১৯৩৩ সনে। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে জানিয়ে রাখা ভালো অমর্ত্য সেনের নাম রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কারণ, তাঁর মায়ের পরিবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষক, আর অমর্ত্য সেনের মা অমিতা সেনকে নাচের তালিম দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কবিগুরুর অনেক নৃত্যনাট্যে অমিতা সেন অভিনয় করেছেন।

যাই হোক, বাঙালি সংস্কৃতির নিয়ম অনুযায়ী প্রথম সন্তান প্রসবের আগে মেয়েরা যেমন বাবার বাড়ি চলে যান, তেমনি অমিতা সেনও চলে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন। ছেলে কোলে নিয়ে তিনি যখন আবার ঢাকায় ফেরেন অমর্ত্য সেনের বয়স তখন দুমাস।

ঢাকা-কলকাতায় আসা-যাওয়া থাকলেও অমর্ত্য সেনের ছেলেবেলার প্রথম স্মৃতি গড়ে ওঠে বার্মা ঘিরে। কারণ, তিন বছর বয়সেই পিতার

কর্মসূত্রে সপরিবারে তাদের বার্মা চলে যেতে হয় তিন বছরের জন্য। ১৯৩৬ সালে বার্মা গিয়ে তারা আবার ঢাকা ফিরে আসেন ১৯৩৯ সালে। সুতরাং ঢাকার স্মৃতি অমর্ত্য সেনের মনে গাঁথতে থাকে ছয় বছর বয়স থেকে।

ঢাকায় ফিরে তিনি সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে ভর্তি হন। প্রায় ৮০ বছর বাদে সেই স্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে লিখেন, স্কুলটি আমাদের বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে নয়। লক্ষ্মীবাজার। মিশনারি স্কুল। চালাত আমেরিকাভিত্তিক একটি ফাউন্ডেশন। কিন্তু, শিশুদের মধ্যে এমন একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে সাদা চামড়ার শিক্ষকরা এসেছেন বেলজিয়াম থেকে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ব্রাদার জুদা। স্কুলটি নিয়ে তার গর্বের সীমা ছিল না। তিনি বলতেন আমাদের ছেলেরাই সব সময় প্রথম হয়।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অমর্ত্য সেনকে আমন্ত্রণ জানানো হয় সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য। স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক তখন এক অদ্ভুত কথা বলেন অমর্ত্য সেনকে, 'ছাত্রদের অবাক করে দিতে আপনার পুরোনো রেজাল্ট কার্ড বের করেছিলাম। দেখলাম আপনি ৩৭ জনের মধ্যে ৩৩তম হয়েছেন। ধারণা করছি আপনি ভালো ছাত্র হয়েছেন সেন্ট গ্রেগরি ছাড়ার পরে।'

অমর্ত্য সেনও এটা স্বীকার করেছেন। সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের বাধাধরা নিয়ম অমর্ত্য সেনের খুব ভালো লাগত না। শান্তিনিকেতনে গিয়েই তিনি মুক্ত-হাওয়ার পরিবেশ খুঁজে পান।

ছেলেবেলার স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে অমর্ত্য সেন বাংলাদেশের নদ-নদীর কথাও বলেন। বাংলাদেশের নদ-নদী নিয়ে আলাদা একটা অধ্যায়ই আছে–দ্য রিভার্স অফ বেঙ্গল। হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড-এর দ্বিতীয় অধ্যায়। বিস্তৃতভাবে বলেছেন পদ্মানদীর কথা। প্রথমবার পদ্মানদী দেখে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এটা কি সত্যিই নদী! এর জল কি লবণাক্ত নয়?

তখন তাদের দূরে কোথাও যেতে হলে নদী-পথেই যেতে হতো। সে মানিকগঞ্জ হোক, বিক্রমপুর হোক, সোনারগাঁ হোক আর কলকাতা হোক। মানিকগঞ্জের মত্ত গ্রামে অমর্ত্য সেনের দাদার বাড়ি। এখন ঢাকা থেকে মানিকগঞ্জ যাওয়া কোনো বিষয় না। কিন্তু, তখন সারাদিনের ব্যাপার। নদী-পথ ছাড়া গতি নেই। মায়ের পৈতৃকভিটা বিক্রমপুর যাওয়ার কথাও স্মরণ করেন তিনি, নদীপথই ভরসা। কলকাতা যেতে হলেও নারায়ণগঞ্জ থেকে দীর্ঘ নৌযাত্রায় যেতে হতো প্রথমে গোয়ালন্দ পর্যন্ত, সেখান থেকে কলকাতার ট্রেন।

এর মধ্যে নৌভ্রমণের এক অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করেন তিনি। তখন তার ন'বছর বয়স। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবা ঘোষণা করলেন একটা মাস তারা নদীতে ঘুরে ঘুরেই কাটিয়ে দেবেন। ভাড়া করা হলো একটা ছোট্ট হাউজবোট। উদ্দেশ্য জালের মতো ছড়িয়ে থাকা বাংলার নদীগুলো ঘুরে ঘুরে দেখবেন। অমর্ত্য সেনের মনে হলো জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন। আর হয়েছিল তা-ই। বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, মেঘনা হয়ে বোট গিয়ে পড়ল পদ্মায়। চারদিকে জল আর জল। দূরে দূরে সবুজ গ্রাম। মাঠ-প্রান্তর। পাখির কুজন। তিনি আর তার ছোটবোন মঞ্জু বসে বসে মুখস্থ করতে লাগলেন পাখির নাম, গাছের নাম, মাছের নাম।

এ-প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়, যে, ছেলেমেয়েদের শিক্ষাটা কীভাবে হয় এর মধ্যে তা নিহিত আছে। এমনি এমনি তো কেউ আর বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তি হন না। তাকে গড়ে তোলে তার পরিবার। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে ছোটবেলার এই শিক্ষাই তো মানুষকে বড় করে গড়ে তোলে। একমাসের ছুটি পেয়ে বাবা আশুতোষ সেন যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে নদীপথে ঘুরতে বেরিয়ে পড়লেন এটাই তো তাদের ছেলেবেলার সঞ্চয়, তারপর এ-যাত্রাই তাদের জীবনপথে উত্তাল-সাগর পাড়ি দিতে সাহায্য করেছে।

নদীপথে ঘুরতে ঘুরতে অচেনা কিছু দেখলেই বাবাকে জিজ্ঞেস করতেন অমর্ত্য সেন, বাবাও পরম আগ্রহে সবকিছুর বর্ণনা দিতেন। শুশুক যে এক প্রকার ডলফিন এবং এরা যে অন্য মাছ খেয়ে ফেলে এ-কথা শুনে তিনি অবাক হয়েছিলেন। তাদের বোটের পাশেই শুশুকগুলো মাথা উঁচিয়ে শ্বাস নিচ্ছিল, এ-দৃশ্য দেখে অমর্ত্য সেনের কিশোর মন নেচে উঠছিল। শুধু প্রকৃতি নয়, তাদের সঙ্গ দিচ্ছিল কবিতাও। বাবা-মা সাথে করে নিয়ে গেছেন অনেক বই। বিশেষ করে বাংলা ও ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ। বাবা-মা তো পাঠ করে শোনাচ্ছেনই, সময়ে সময়ে অমর্ত্য সেনও পাঠ করছেন। আর প্রকৃতি ও কাব্যগ্রন্থের সাথে অমর্ত্য সেন পাঠ করছিলেন বাংলার মানুষ। গ্রামের সমাজচিত্র। নদীতীর ধরে ধরেই গড়ে উঠেছে গ্রামের পর গ্রাম। নদীতীরের ছোট ছোট দরিদ্রগ্রামগুলো দেখে তার মন ব্যথিত হয়। দেখেন মানুষের কী কঠিন জীবনসংগ্রাম! জীবন-মৃত্যু হাতে নিয়েই যেন তারা থাকেন। যে-নদী এত সুন্দর, মানুষের জীবনজীবিকা যোগায়, সে-নদীও আবার কত ভয়ংকর হতে পারে! মায়ের কাছে শোনেন, এইসব শান্তশিষ্ট নদী বর্ষাকালে গ্রামগুলো গিলে খেয়ে ফেলে। সুন্দর আর ভয়ংকর পাশাপাশি বাস করতে দেখে সেই কিশোর বয়সেই অমর্ত্য সেনের মন কেমন করে ওঠে।

শুধু নদীর সৌন্দর্যের কথা বলেই তিনি খ্যান্ত থাকেননি। এর সঙ্গে যোগ করেছেন নিজের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। নদী ঘিরেই যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে সে-কথা স্মরণ করে লিখেছেন–নদী ঘিরেই এক সময় ঘুরেছে অর্থনীতির চাকা। কলকাতা যেমন গড়ে উঠেছে গঙ্গার তীরে, পূর্ব বাংলার শহর-বন্দর-গঞ্জও গড়ে উঠেছে একেক নদীর তীরে। তবে, নৌচলাচলের অসুবিধার কারণে পূর্ব বাংলা যে কলকাতা বা দিল্লির চেয়ে পিছিয়ে ছিল সে-কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

আবার এই নদীবাহিত-ভূগোলে যে-কাব্য-সাহিত্যের বিস্তার হয়েছে সে-কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। চর্যাপদ থেকে মনসামঙ্গলকাব্য এবং পরবর্তীতে আধুনিক সাহিত্যেও কীভাবে বাংলার নদী-বিধৌত-জল-আবহাওয়ার প্রভাব পড়েছে তার কথা উল্লেখ করেছেন। আধুনিক সাহিত্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী' (১৯৪৫) উপন্যাসটির কথা উল্লেখ করেন। পদ্মা-তীরবর্তী অঞ্চলের এক পরিবারের জীবনসংগ্রামের গল্প 'নদী ও নারী'। এক মুসলিম পরিবারের গল্প, যেমনটা হুমায়ুন কবির ছিলেন, নদীভিত্তিক কৃষিনির্ভর ধর্মশাসিত সমাজে তারা কীভাবে টিকে থাকে তাই এই উপন্যাসের আলোচ্য-বিষয়। উপন্যাসের কিছু সংলাপও অমর্ত্য সেন উল্লেখ করেছেন, 'আমরা নদীর মানুষ। আমরা কৃষক। আমরা নদীর বালুচরে আমাদের বাড়ি বানাই, পানি এসে সব ধুয়ে নিয়ে যায়। আমরা আবারও বাড়ি বানাই, পোড়োভূমি ছেনে আমরা সোনার ফসল ফলাই।'

ঢাকা ও বাংলাদেশের কথা বলতে গিয়ে বারবারই অমর্ত্য সেন স্মৃতিকাতর হয়েছেন। এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন ঢাকায় তার বাবা-মায়ের যেমন খুব ভালো সময় কেটেছে, তেমনি তার ও তার ছোটবোন মঞ্জুরও। ঢাকার কথা স্মরণ করতে গিয়ে বলেছেন তার জেঠামশাই জিতেন্দ্রপ্রসাদ সেনের কথা, যিনি ছিলেন সরকারি অফিসার, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন চাকরিসূত্রে। হঠাৎ ঢাকা আসলে বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। তার কন্যা মীরাদি ছিলেন অমর্ত্য সেনেরই বয়সি। ছুটিতে বেড়াতে এলে তাদের নিয়ে যে আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি হতো, অমর্ত্য সেন উল্লেখ করেছেন, এসবই তার ছেলেবেলার মধুর স্মৃতি।

আর ছিলেন অর্মত্য সেনের এক দাদামণি, তার জেঠামশাইয়ের ছেলে, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন, এবং অমর্ত্য সেনদের সাথেই থাকতেন, তিনি ছিলেন অর্মত্য সেনের ছেলেবেলার নায়ক, জ্ঞানের এক ভাণ্ডার। সুযোগ পেলেই যিনি অমর্ত্য সেনকে শিশুদের চলচ্চিত্র দেখাতে নিয়ে যেতেন। তার কারণেই দেখা হয় দ্য থিফ অফ বাগদাদ ছবিটি।

ছেলেবেলায় ঢাকাতে অমর্ত্য সেনের আরেকটা আনন্দময় ব্যাপার ছিল বছরে একবার মানিকগঞ্জের মত্ততে দাদার বাড়ি যাওয়া। সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকতেন। ছুটিতে-উৎসবে গ্রামের অন্য ছেলেমেয়েরাও দূরের শহর-গ্রাম থেকে কিছুদিনের জন্য গ্রামে আসত। তাদের সাথে কয়েকদিনের জন্য বন্ধুত্ব হতো। তারপর এক বছরের জন্য বিদায় জানিয়ে আবার তিনি ঢাকায় ফিরে আসতেন। •

কামরুল আহসান
কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক

সার্ধশত মৃত্যুবর্ষ

দীনবন্ধু মিত্রের গল্পভাষা

মামুন রশীদ

দীনবন্ধু মিত্র (১০ এপ্রিল ১৮৩০ – ১ নভেম্বর ১৮৭৩)

বাংলার নীল চাষিদের ওপর নীলকর ইংরেজদের চালানো অত্যাচারের লিখিত দলিল 'নীলদর্পণ'। নীলচাষ নিয়ে বাংলার কৃষকের যে বেদনাদায়ক অধ্যায়, লাঞ্ছনা, নিপীড়ন, নির্যাতনের মর্মান্তিক অধ্যায় জীবন্ত করে তুলেছিলেন দীনবন্ধু মিত্র (১০ এপ্রিল ১৮৩০–১ নভেম্বর ১৮৭৩)। এই নাটক তাকে খ্যাতি এনে দেয়। 'নীলদর্পণ'ই তার রচিত প্রথম নাটক। সরকারি চাকরি করায় নাটকটি নিজের নামে প্রচার করতে পারেননি। নাটকের রচয়িতা হিসেবে ব্যবহৃত হয় নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ-কেনচিৎ-পথিক ছদ্মনাম। নাটকটি বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মতো সমাজে প্রভাব ফেলে। নাটকের নামের মধ্যেই রয়েছে কাহিনির ইঙ্গিত

নীল চাষকে কেন্দ্র করে বাংলার কৃষকের ওপর যে অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতন চলেছে, যেভাবে মানুষকে শোষণ করা হয়েছে, দাসত্বের শেকল পরিয়ে রাখা হয়েছে, তারই তীব্র প্রতিবাদ নীলদর্পণ।

শুধু নীলচাষিদের প্রতি অত্যাচার-জুলুমের চিত্র উঠে আসার জন্যই নয়, এই নাটকটি আরও নানা কারণে ইতিহসের সাক্ষী। নাটকটি প্রকাশ পায় ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত এটিই প্রথম নাটক। এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ পায় Nil Durpan, or The Indigo Planting Mirror নামে। প্রকাশক ছিলেন পাদ্রী রেভারেন্ড জেমস লঙ। আদালতে মামলা ওঠে। লেখককে না পাওয়ায় প্রকাশকের দণ্ডাদেশ হয়। তাৎক্ষণিকভাবে আদালতের দেওয়া অর্থদণ্ড পরিশোধ করেন বাংলা সাহিত্যের আরেক কৃতিপুরুষ কালীপ্রসন্ন সিংহ। ইতিহাসে নাটকটির সঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের দত্তের নামও জড়িয়ে আছে। বলা হয়, তিনি নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। যদিও এর সপক্ষে গবেষকদের হাতে জোরালো তথ্যপ্রমাণ নেই। নীলদর্পণই প্রথম বাংলা নাটক, যেটি বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই নাটক প্রচারের পরই নীলকরদের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নাটকটি পাঠানো হলে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করে। নীলকরদের অমানুষিক নির্যাতন ও বর্বরতা বন্ধে আইন প্রণীত হয়। আমাদের জাতীয়তাবোধের প্রেরণাও এই নাটকের মধ্য দিয়েই প্রথম প্রকাশ পায়। বাংলার কৃষক পায় দাঁড়ানোর শক্তি।

দীনবন্ধু মিত্রের সমসাময়িক লেখক মাইকেল মধুসুদন দত্ত (২৫ জানুয়ারি ১৮২৪–২৯ জুন ১৮৭৩) খুলে দিয়েছিলেন বাংলা নাটকের নতুন উৎসমুখ। তিনি পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক কাহিনির নবরূপায়নের মাধ্যমে বাংলা নাটকে আনেন আধুনিকতার ছোঁয়া। সেপথ ধরেই বাংলা নাটকে আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিন্তু দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাটক রচনা করতে এসে মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেখানো পথে তো নয়ই, প্রচলিত পথও অনুসরণ করেননি। তিনি মনোযোগ দেন সামাজিক সমস্যার দিকে। মানুষের যন্ত্রণাকাতর জীবনকে আখ্যানকে উপজীব্য করে তিনি দৃশ্যকাব্য জগতে আরেক দিকের উন্মোচন করেন।

নীলদর্পনের সাফল্য দীনবন্ধুকে মিত্রকে আরও লেখায় উৎসাহিত করে। সেইসঙ্গে ডাকবিভাগে বদলির চাকরির সুবাদে দেশের নানাপ্রান্ত ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ তাকে মানুষ ও জীবন দেখার অভিজ্ঞতা এনে দেয়। সঙ্গে মানুষ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা তার লেখার প্রেরণা। দীনবন্ধু মিত্রর লেখা প্রথম প্রকাশ পায় কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ

প্রভাকর' পত্রিকায়। অন্যান্য অনেক লেখকের মতো তিনিও সাহিত্যরচনা শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে। তার কবিতাগুলো মলাটবদ্ধ হয়ে সুরধুনীকাব্য নামে প্রকাশ পায় ১৮৭১ সালে, এটি ছিল কাব্যগ্রন্থটির প্রথম ভাগ। পরবর্তীতে ১৮৭৬ সালে কাব্যটির দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ পায়। আর ১৮৭২ সালে প্রকাশ পায় দ্বাদশ কবিতা। কবিতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে তিনি নাটক রচনায় মনোযোগী হন। তার দ্বিতীয় নাটক নবীন তপস্বিনী প্রকাশ পায় ১৮৬৩ সালে। বিয়েপাগলা বুড়ো নাটক প্রকাশ পায় ১৮৬৬ সালে। এছাড়া প্রহসন সধবার একাদশী প্রকায় পায় ১৮৬৬ সালে, লীলাবতী ১৮৬৭ সালে এবং জামাই বারিক ১৮৭২ ও কমলেকামিনী প্রকাশ পায় ১৮৭৩ সালে।

আমাদের আলোচনার বিষয় দীনবন্ধু মিত্রের গল্প। তিনি দুটি গল্পও লিখেছিলেন। যদিও গল্পদুটি তিনি বেঁচে থাকতে গ্রন্থভুক্ত হয়নি। পরবর্তীকালে তার রচনাসমগ্রে গল্প দুটি জায়গা করে নেয়। প্রথম গল্প 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' প্রকাশ পেয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ১২৭৯ বঙ্গাব্দের (১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ) প্রকাশিত এই বাংলা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা বা সাময়িকপত্রটিতেই তার দ্বিতীয় গল্প 'পোড়া মহেশ্বর'ও ছাপা হয়। 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' এবং 'পোড়া মহেশ্বর' শিরোনামের গল্পদুটির বিষয় এবং ভাষাভঙ্গীকে আমরা বর্তমানের প্রেক্ষাপটে রেখে দেখতে পারি। অপ্রাসঙ্গিক হলেও জানিয়ে রাখা 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' গল্পটির ওপর ভিত্তি করে ১৯৫৮ সালে বাংলা ভাষায় চলচিত্র নির্মাণ করেন প্রযোজক প্রফুল্ল চক্রবর্তী। একই বছরে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ শেষে মুক্তি পায়। ১৯৬০ সালে তামিল এবং তেলেগু ভাষাতেও চলচ্চিত্রটি পুনর্নির্মাণ হয়।

বাংলা ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার 'কামিনী প্রকাশনালয়' থেকে মধুসূদন ও দীনবন্ধু রচনাবলী শিরোনামে সংকলনে যদিও 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' এবং 'পোড়া মহেশ্বর'কে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে উপন্যাস হিসেবে। তবে দীনবন্ধু মিত্রর এই দুটি রচনা উপন্যাস না গল্প সে তর্কে যাবার চেয়ে, এর বিশেষত্বগুলো নিয়ে কথা বলা যায়। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ–এ রয়েছে মাত্র দুটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে–খুবই গুরুগম্ভীর ভাবে। যমালয়ের আবহ ফুটিয়ে তোলার জন্য ভাষাতেও আনা হয়েছ কৃত্রিম গাম্ভীর্য। যার ভেতরে নাটকীয়তাও রয়েছে ষোলো আনা। দীনবন্ধু মিত্র তার নাটকের জন্য যে ভাষাভঙ্গীকে আয়ত্ব করেছিলেন, বর্ণনায় এবং সংলাপের প্রয়োজনে যে মুখের ভাষাকে তুলে এনেছিলেন, এ গল্পেও সেধারা রয়েছে। তবে এখানে বর্ণিত গুরুগম্ভীর ভাষাটি কৃত্রিম নয়, তা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। উদাহরণ দিতে রচনার শুরু থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করি। 'একদা নিদাঘকালে রাজর্ষি যমরাজ ভগবান মরীচিমালীর প্রখরকরনিবন্ধন দিবাভাগে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় অসমর্থ হইয়া নিশীথ সময়ে মহাসমারোহে কাছারি আরম্ভ করিলেন। গ্যাসালোকে সভামণ্ডপ আলোকময়, ফরাসীপ্রসীয় মহাযুদ্ধ হইবার অব্যবহিতকাল পূর্ব্বে ক্রীত বিস্তীর্ণ ফরাসি গালিচা বিস্তারিত, দেয়ালে নৈপুণ্যকুশল শিল্পীশ্রেষ্ঠ ম্যাকেববিনির্ম্মিত ঘু ঘু ঘড়ী, কয়েকখানি সম্পূর্ণমূর্ত্তি দর্শনোপযোগী মুকুর। কিন্তু সকলের উপরেই আবরণ; কাণ, কালান্তক মহোদয় এক দিন কাচাভ্যন্তরে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ইংরাজি দশ ঘন্টা একাদশ মিনিট মূর্চ্ছিতাবস্থায় নিপতিত ছিলেন।' পুরো গল্পেই ছড়িয়ে রয়েছে নাটকের ছায়া। পার্থক্য নাটকের সংলাপ নেই, রয়েছে উত্তম পুরুষে বর্ণনা। গল্পের প্রধান চরিত্র, যাকে কেন্দ্র করে গল্পটি এগিয়ে চলেছে, সেই কুড়রাম, তাকে ভুল করে যমালয়ে নিয়ে আসার আগের পরিবেশ বর্ণনা করার আগে যমরাজ সভায় বসে প্রশ্ন করছেন, 'অদ্যকার বিশেষ কার্য্য কি?' তখন যমালয়ের প্রধান মুন্সি চিত্রগুপ্ত অচিরাং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, 'ভগবন, অদ্য পি, এন্ড কোম্পানির স্টীমারে ভীয়া ব্রিন্ডিসি একখানি সরকারী চিটি এবং সমীরণ যানে একখানি বেনামি দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি; উভয়ই বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত এবং উভয়ই 'জরুরি' শব্দাঙ্কিত।' সেই চিঠির একটি থেকে জানা যায়, বাগেরহাট সাব-ডিবিজানের অন্তর্গত লোচনপুর পরগণার মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু পতন রায় জমীদার মহাশয়ের লোকের সহিত প্রমাদ নগরের পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামনাথ চৌধুরীর গাঁতিদার মহাশয়ের লোকের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষে অনেকে হতাহত। কিন্তু সমস্যার শুরু, যারা হত হয়ে ধান্যক্ষেত্রে পড়ে ছিল, তাদের সবাইকে যমালয়ে নিয়ে আসা হলেও দূতেরা একজনকে আনতে পারে নাই। কারণ রায় মহাশয়ের লোকেরা সেই হত ব্যক্তিকে এমন স্থানে লুকিয়ে ফেলেছে, যাকে যমালয়ের দূতেরা খুঁজে পায় নাই। এখন চিঠিতে তার খোঁজ জানানো হয়েছে। যমরাজ স্বাভাবিকভাবেই চিঠি পেয়ে উৎকালিকাকুল হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুতগামী বেহারা প্রেরণের আদেশ দিলেন। আদেশ প্রাপ্ত হয়ে বেহারারা মুহূর্তের মধ্যে ধরণীতে এলেও, গোল বাধলো রামানাথ চৌধুরীর লোকেরা মৃত নায়েবের মৃতদেহ আবারো লুকিয়ে ফেলায়। এর মধ্যে সেখানে এসে সেই শূন্য খাটিয়ায় বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়ে কুড়রাম। আর যমালয়ের দূতেরা ভুল করে তাকেই তুলে নিয়ে যায় যমালয়ে। কুড়রামের যে বর্ণনা দীনবন্ধু মিত্র দিয়েছেন, তা দক্ষ কথাসাহিত্যিকের বর্ণনাই। কুড়ারাম দেখতে কেমন? গল্প থেকেই একটু উদ্ধৃত করি। 'উদরটি স্থুল, কিন্তু নিরেট, অদ্যাপি ভুঁড়ি বলিয়া পরিগণিত হয় নাই।' তার কুড়রাম নামের ব্যাখ্যাও রয়েছে এভাবে, 'কুড়রাম জননীর অদূরদর্শিতাহেতু আস্তাকুঁড়ে ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন, ধাত্রী তাঁহাকে সে স্থান হইতে কুড়াইয়া আনে, সেই জন্য তাঁহার নাম কুড়রাম।' সেই কুড়রাম যমালয়ে জীবন্ত উপস্থিত হয়ে কিকরে যমরাজের যাতনার কারণ হলেন, যমরাজের চাকরি হারানো, তারপর কি করে লক্ষ্মীর সহায়তা নিয়ে বিষ্ণুর কৃপায় নিজ পদ ফিরে পেলেন এবং কুড়রামের মর্ত্যে যথাস্থানে ফিরে আসা তারই প্রাণবন্ত বর্ণনা এই গল্প। হাস্যরসাত্মক এই গল্পটি তুলনামূলক কয়েক পৃষ্ঠার হলেও 'পোড়া মহেশ্বর' গল্পটি নাতিদীর্ঘ। এই গল্পটিও হাস্যরসাত্মক গল্পের ভুবনে অনন্য সংযোজন। আমরা গল্পের কাহিনির চেয়ে এখানে দীনবন্ধু মিত্রের গদ্যর উদাহরণ টানতে আগ্রহী। এর মাধ্যমে বাংলা গদ্যের বিকাশ পর্বের ধারাটির সঙ্গে পরিচয়ের যোগসূত্র তৈরি হবে। গল্পের শুরু, 'ইস্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের চাগদা স্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে পোড়া মহেশ্ব-দর্শনাভিলাষী পথিকের অভিলাষ সফল হয়। পথিমধ্যে একখানি মাত্র গণ্ডগ্রাম আছে; সে গ্রামখানির নাম ভট্টাচার্য্য-কামালপুর। বহুকালাবধি কামালপুর অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন বিবিধ শাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতপটলের আবাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে এ স্থানে অনেক লোক বাস করেন বটে, কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ বিজ্ঞ অধ্যাপক অতি বিরল, বোধ হয় বিদ্যাবিশারদ বনমালী বিদ্যাসাগর মহোদয়ের সহিত বীণাপানির পরলোক হইয়াছে।'

দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যের উৎকর্ষ এবং গভীরতা নিয়ে যুগে যুগে সমালোচকরা আলোচনা করেছেন। তার নাটকের ভুল-ত্রুটিও নির্ধারণ করেছেন। দীনবন্ধু মিত্র সাহিত্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন মানুষের কল্যাণার্থে। তিনি জীবনের জন্য শিল্পকে গুরুত্ব দিয়েছেন। নিছক শিল্পসৃষ্টি তার উদ্দেশ্য যে ছিল না, তা স্পষ্ট নিদর্শন তার রচনাবলি। সাহিত্যসম্রাট খ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তার আলোচনায় দীনবন্ধু মিত্রর শিল্পী স্বভাব সম্পর্কে বলেছেন, 'তাঁহার চরিত্র প্রণয়ন প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন। কোনো চরিত্র পরিকল্পনায় নয়, কাহিনি কল্পনায় রূপাঙ্গিক রচনায় সর্বত্রই তিনি চিত্রকর বা ফটোগ্রাফার কিন্তু চিত্রশিল্পী নন। রসিকতা করে আর বলেছেন যে, 'সামাজিক বৃক্ষে বানর দেখিলে দীনবন্ধু লেজসুদ্ধ বানর অঙ্কন করিতেন।' দীনবন্ধু মিত্র মানুষকে ভালোবেসেছেন। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তাকে বেদনার্ত করেছে। সেখান থেকে তিনি মানুষের উপকারার্থে সাহিত্যের উপাদান খুঁজে ফিরেছেন। তবে যে সাহস এবং দায়িত্ববোধের পরিচয় তার লেখায়, তা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। নাটকে, প্রহসনে তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পেও রয়েছে তার সেই সাহস ও দায়িত্ববোধের প্রকাশ। কুড়রাম চরিত্রটির মাধ্যমে তিনি যে আঘাত করেছেন, ক্ষমতার প্রতীকায়ণের মধ্য দিয়ে যে সূক্ষ্ম খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন মানুষকে, সে কারণেও তিনি সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়। তার প্রয়াণের সার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধা।

মামুন রশীদ
কবি, সাংবাদিক

রামেন্দু মজুমদার (জন্ম ৯ আগস্ট ১৯৪১–)

সাক্ষাৎকার

আমরা রাস্তাঘাটে যতটা চিৎকার করেছি শিল্পে ততটা কনসেন্ট্রেট করিনি

রামেন্দু মজুমদার

রামেন্দু মজুমদার। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর দেশের প্রথম নাটকের পত্রিকা 'থিয়েটার' প্রকাশ করেন। প্রতিষ্ঠা করেন নাট্যগোষ্ঠী 'থিয়েটার'। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট (আইটিআই)র বাংলাদেশ কেন্দ্র ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। আইটিআই-র বিশ্ব সভাপতি ছিলেন ছয় বছর, বর্তমানে সাম্মানিক সভাপতি। বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে লাভ করেছেন একুশে পদক ও বাংলা একাডেমির সম্মানসূচক ফেলোশিপ। নাট্যচর্চার সাথে তাঁর সার্বিক ভ্রমণ এবং ভারত-বাংলাদেশের নাট্যচর্চার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করেছেন কবি ও নাট্যকার **অপু মেহেদী**

নাটকের সাথে আপনার সম্পৃক্ততার গল্প দিয়েই শুরু করি...

পারিবারিকভাবেই আমি নাটকের সাথে যুক্ত। আমার বাবা শখে নাটক করতেন, বড় ভাইয়েরাও করতেন। সেই সূত্রে আমি যখন স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ি, তখন প্রথম 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে অভিনয় করি। নাটকে আমার রোল ছিলো ইংরেজ সেনাপতি 'ওয়াটস' এর চরিত্র। সেখানে পুরো নাটকে আমার মাত্র দুটো সংলাপ। কিন্তু তার জন্যই কতো যে প্রস্তুতি!

স্কুল লাইফ এবং পরবর্তীতে কলেজ লাইফে আপনি রেগুলার নাটক করতেন।

স্কুল লাইফে তেমন নাটক করার সুযোগ হতো না আমাদের। তবে কলেজে পড়ার সময় করেছি। কলেজ যখন ছুটি হতো, বাড়িতে এসে আমরা রিহার্সাল করতাম। তবে রিহার্সালকৃত সব নাটক যে অভিনীত হয়েছে তা নয়। আর আমি তো লক্ষ্মীপুরে বড় হয়েছি। লক্ষ্মীপুরে তেমন কোনো মঞ্চ ছিলো না। আমরা খেলার মাঠের মধ্যে মঞ্চ বানিয়ে অভিনয় করতাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই 'রক্তাক্ত প্রান্তর'-এ অভিনয় করলেন।

'রক্তাক্ত প্রান্তর'-এর আগে হলের নাটক করেছি একটা। আমাকে হলের নাটকে যুক্ত করেছিলেন তৎকালীন আমাদের জগন্নাথ হলের হাউজ টিউটর এবং ইংরেজি বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা। তিনি একদিন আমাকে বললেন যে, মুনীর চৌধুরী একটা নাটক করবেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার কাছে কোনো ছেলে আছে কিনা। আমি তোমার কথা বলেছি। আগামীকাল তুমি একবার মুনীর চৌধুরীর বাড়ি যাবে। তা শুনে আমার তো উত্তেজনায় আর ঘুম আসছিলো না। পরের দিন গেলাম, তিনি আমাকে 'রক্তাক্ত প্রান্তর' পড়ে শোনালেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কয়েকজন অধ্যাপক এবং আমরা ছাত্ররা মিলে নাটকটা করেছিলাম। ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে পরপর দুইদিন প্রদর্শিত হয়েছিলো।

১৯৬৩ সালে শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' নাট্যরূপ দিলেন।

তখনকার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, যেটা আজকের টিএসসি, সেটা প্রথমে যখন আমরা শুরু করি তখন বিল্ডিং ছিলো না। কার্জন হলের একটা কক্ষ থেকে এটার কাজ পরিচালিত হতো। তো এটার সঙ্গে কাজ করার জন্য বিভিন্ন হল থেকে নমিনেশন নেওয়া হয়েছিলো। একজন করে ছাত্র নেওয়া হবে যারা বিভিন্ন এক্টিভিটিতে পার্টিসিপেট করবে। জগন্নাথ হল থেকে আমাকে নমিনেট করা হয়েছিলো। এখানে কয়েকটা গোষ্ঠী করা হলো- ছাত্র-শিক্ষক নাটক গোষ্ঠী, ছাত্র-শিক্ষক সংগীত গোষ্ঠী, ছাত্র-শিক্ষক লেখক গোষ্ঠী ইত্যাদি। তখন নাটক গোষ্ঠীতে সেক্রেটারি কিংবা প্রেসিডেন্ট ছিলো না। তার বদলে বলা হতো ছাত্র তত্ত্বাবধায়ক ও শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক। রফিকুল ইসলাম স্যার ছিলেন শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক আর আমি ছিলাম ছাত্র তত্ত্বাবধায়ক। সেখানে আমরা নাটক করব। কিন্তু কোন নাটক করব? তখন আসকার ইবনে শাইখ-ই আমাকে বললেন যে, শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' করো। এটা নাটকের মতোই লেখা আছে, নাট্যরূপ দেয়াও সহজ হবে। তখন আমি চট করে বসে গেলাম এবং নাট্যরূপ দিলাম। সেটা ছিলো কার্জন হলের প্রথম অভিনীত নাটক।

এরপর তো আপনি 'ভ্রান্তি বিলাস' এর নাট্যরূপ দিলেন।

ক্রীতদাসের হাসির পর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা একাডেমির আয়োজনে মঞ্চস্থ করলাম 'কৃষ্ণকুমারী'। সেখানে মুনীর চৌধুরী এবং কাজি ইরফান আমিন অভিনয় করেছিলেন। তারপর আমরা করলাম 'ভ্রান্তি বিলাস'। শেক্সপিয়ারের ৪০০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে। এটাও বাংলা একাডেমির আয়োজনে। শেক্সপিয়রের 'দ্যা কমেডি অব এররস'-এর চমৎকার বাংলা উপন্যাস অনুবাদ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সেটার নাট্যরূপ দিয়েছিলাম আমি। নাট্যরূপ দিতে গিয়ে আমি দেখলাম, বিদ্যাসাগর কিন্তু মূলের খুব কাছাকাছি ছিলেন, অনুবাদের মধ্যে।

কখন থেকে আপনার মনে হলো যে আপনি নাটক-ই করবেন?

বিশ্ববিদ্যালয় আসার পরে নাটক নিয়েই মেতে ছিলাম। লেখাপড়া বাদ দিয়ে নাটকটাই বেশি করতাম। নাটক করতে করতে এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছিলো যে দেখা হলেই পরিচিতরা বলতো, 'কিরে তোর এই বেলায় নাটক নাই?'

যখন আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় নাটক করছেন তখন কিন্তু কোলকাতাতে পুরোদস্তুর থিয়েটার চলছে।

হ্যাঁ, কিন্তু পাকিস্তান আমলে কলকাতার সাথে আমাদের যোগাযোগটা তেমন ছিল না। যাতায়াতটাও খুব সীমিত ছিল। তাই তখন ওদের দ্বারা আমরা কোনোভাবে ইনফ্লুয়েন্সড হইনি। ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়। তখন অনেক নাট্যকর্মী সেখানে গিয়েছে। তখন কলকাতায় গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন একেবারে তুঙ্গে। সেখান থেকে আমরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি।

আপনি কি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে কলকাতা গিয়েছিলেন কিংবা সেখানকার নাটক দেখেছিলেন?

হ্যাঁ, গিয়েছি। তখন আমি তাপস সেনের দুটো ঐতিহাসিক নাটক দেখতে পেরেছিলাম–'অঙ্গার' এবং 'সেতু'। আমি তখন কলকাতায় গিয়ে শম্ভু মিত্রের নাটকও দেখেছি।

ওই সময় 'ড্রামা সার্কেল'-এর সাথে কি আপনার যোগসূত্র ছিল?

না আমার সাথে কোনো যোগসূত্র ছিল না। 'ড্রামা সার্কেল' অসাধারণ পারফেকশন নিয়ে নাটক করত। তাদের কয়েকটা নাটক দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। সেসময় তারা যে ধরনের নাটকের প্রযোজনার মান আনতে পেরেছিলো, আজকেও আমাদের অনেক দল সেই ধরনের মান আনতে পারেনি। তাদের মধ্যে একটা পেশাদারিত্ব ছিল, একটা পেশাদারি মনোভাব নিয়ে তারা নাটক করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো ছিলো।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আপনি ভারত গেলেন কবে?

ভারতে গেলাম ৯ মে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই আমরা অপেক্ষা করছিলাম যে কীভাবে যাওয়া যায়। পরে রেজা আলী আমাদের একটা গাড়িতে করে ইলিয়টগঞ্জের কাছে নামিয়ে দিলেন। সেখানে আমাদের একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন, আমার সঙ্গে আরও তিনজন ছিলেন। আমরা কিছুটা নৌকায়, কিছুটা ভ্যানে, কিছুটা পায়ে হেঁটে সীমান্তবর্তী এক গ্রামে রাত্রি যাপন করি এবং পরদিন ভোরবেলা হেঁটে ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশ করি। সেখান থেকে আগরতলায় সপ্তাহখানেক থাকি। আগরতলায় আবার কলকাতা যাওয়ার টিকিট পাওয়া যায় না। অনেক কষ্টে টিকেট জোগাড় করে কলকাতা গেলাম আমি এবং আমার স্ত্রী। কলকাতা যাওয়ার পরে আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রে যুক্ত হব। সেখানে সৈয়দ হাসান ইমাম এবং আমিরুল হক বাদশা আমার পরিচিত ছিলেন। হাসান ভাই বললেন যে, 'আপনি নিজের নামে খবর পড়তে পারবেন?' আমি বললাম যে, 'সেটা আমার পক্ষে মুশকিল।' কারণ তখন আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই দেশে, আমার কাকাও নোয়াখালীতে। আমার কাজের ফলে তারা বিপদগ্রস্ত হোক সেটা আমি চাইনি। তখন অন্য সবাই কিন্তু ভিন্ন (ছদ্ম) নামে খবর পড়ছেন, কিন্তু আমাকে চাইছেন যে আমি যেন নিজের নামে পড়ি।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় আপনি কি কলকাতাতেই ছিলেন?

নয় মাসের মধ্যে আমরা প্রায় পাঁচ মাস কোলকাতাতে ছিলাম। কোলকাতায় গিয়ে ভাবলাম, কী করা যায়! তখন কলকাতায় মিশন ছিলো, বাংলাদেশ মিশন। সেখানে দেখলাম অনেক পুরনো পত্রপত্রিকা আছে। সেগুলো থেকে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো যে, আমি যদি ইংরেজিতে

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের একটা সংকলন তৈরি করি সেটা একটা ভালো কাজ হতে পারে। তখন আমি ১৯৭০ এর নির্বাচন থেকে একাত্তরের স্বাধীনতা ঘোষণা পর্যন্ত সময় বঙ্গবন্ধু যত বক্তৃতা এবং বিবৃতি দিয়েছেন, সেটা বিভিন্ন পত্রিকা থেকে কেটে বার করলাম। প্রত্যেকটা বিবৃতির আগে একটা নোট দিলাম যাতে পাঠক এই ঘটনাক্রমটা বুঝতে পারে। পরে ইংরেজিতে পাণ্ডুলিপি তৈরি করলাম। এরমধ্যে হঠাৎ করে ফেরদৌসী দিল্লির নেহেরু ইউনিভার্সিটিতে ফেলোশিপ এর একটা সুযোগ পেলো। আমরা তখন দিল্লি চলে যাই। ওখানে যাওয়ার পর পরিচিত হলাম আমাদের এক বন্ধুর সঙ্গে যিনি ওখানকার একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় আছেন। তিনি ওখানে আমাকে এডভারটাইজিং এন্ড সেলস প্রোমোশন-এ একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন। ফেরদৌসী ইউনিভার্সিটিতে ফেলোশিপ করে আর আমি বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করি, এটা করে আমরা মাস চারেক দিল্লিতে ছিলাম এবং তখন এই বইটার চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি তৈরি করে নাম দিলাম 'বাংলাদেশ মাই বাংলাদেশ'। পরে আমাদেরই এক সিনিয়র বন্ধু এবং বিশিষ্ট লেখক লোকনাথ ভট্টাচার্য পরিচয় করিয়ে দিলেন 'ওরিয়েন্ট লংম্যান' নামে একটা প্রকাশনার সাথে। তারা আগ্রহ নিয়ে বইটা ছেপে বের করেছিল। যদিও বের হতে হতে জানুয়ারি হয়ে গিয়েছিল।

কলকাতাতে যখন ছিলেন তখন কি আপনার সাথে সেখানকার নাটক সংশ্লিষ্ট কারো সাথে যোগাযোগ হয়েছে?

না, তেমন পরিচয় হয়নি। তবে সেই সময়ই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এর নাটক দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছি। তখন আমাদের মনে একটা আগ্রহ জন্মে যে, একদিন তো স্বাধীন হবই, আমরাও এভাবে নাটক করতে পারব।

দিল্লীতে থাকাকালীন সময়ে সম্ভবত শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের সাথে দেখা হয়েছিল আপনার।

লোকনাথ ভট্টাচার্যের বন্ধু ছিলেন শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র। তার সুবাদেই দুজনের সাথে দেখা হয়েছিল। তবে দুজনের সাথে আলাদা আলাদা আলাপ হয়েছিল।

দিল্লি থেকেই কি মুনীর চৌধুরীর খবর পেলেন?

হ্যাঁ, দিল্লিতে আমাদের পাশেই থাকতেন কাজী খলিকুজ্জামান আহমেদ। হঠাৎ রাত্রিবেলা কলিংবেল শুনে আমি নিচে গিয়ে দরজা খুললাম, দেখি যে খালিকুজ্জামান সাহেব। উনি সংবাদ দিলেন যে মুনীর চৌধুরীকে মেরে ফেলা হয়েছে! আমি তখন ভেতরে গিয়ে ফেরদৌসীকে খবরটা দেয়ার জন্য মানসিকভাবে একটু প্রস্তুত করলাম। তারপর বললাম। কিন্তু কথাটা ও একেবারেই নিতে পারল না। একেবারেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল।

দেশে ফিরে নাটকের সঙ্গে যুক্ত হলেন কীভাবে?

দেশে ফিরে ৩১ জানুয়ারি 'বাংলাদেশ মাই বাংলাদেশ' বইটা উপহার দেই। তিনি দেখে খুশি হয়ে বললেন, এটা বাংলায় করেন। বাংলায় পরে করেছিলাম কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেটা দেখে যেতে পারেননি। এরপর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলা একাডেমির তখনকার পরিচালক কবীর চৌধুরীর ঘরে আমরা মিলিত হয়ে 'থিয়েটার' দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেই। মূলত আমরা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে যারা একসঙ্গে কাজ করতাম তারা- আমি, আব্দুল্লাহ আল মামুন, ফেরদৌসী মজুমদার, ইকবাল বাহার চৌধুরী, ডলি আনোয়ার, মোতাহার হোসেন, নিতুন কুন্ডু, আহমেদ জামান চৌধুরী। আহমেদ জামান চৌধুরী প্রথম আমাদের দলের নামটা বলেছিল 'থিয়েটার ৭২'। তো আমরা ৭২ না দিয়ে শুধু 'থিয়েটার' দেই।

থিয়েটার পত্রিকা তো প্রথমে আপনারা দলের মুখপত্র হিসেবে বের করেছিলেন?

প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম মুখপত্র। পরে আমরা ঠিক করলাম যে এটা দলের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকবে না, সামগ্রিক হবে।

দীর্ঘ ৫০ বছরে বেশি সময় ধরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে থিয়েটার পত্রিকা বের হচ্ছে। এপর্যায়ে এসে পত্রিকাটি নিয়ে আপনার উপলব্ধি কী?

আমি মনে করি যে, নাটকের ক্ষেত্রে আমি যত কাজ করেছি তার মধ্যে এটা একটা স্থায়ী কাজ হয়েছে। এটার জন্য আমি গর্ববোধ করি যে, এই পত্রিকার মাধ্যমে দু'শোর অধিক নাটক আমরা প্রকাশ করেছি।

ওই সময় তো নাগরিক এক ধরনের নাটক করছে, আরণ্যক এক ধরনের নাটক করছে, ঢাকা থিয়েটার এক ধরনের করছে, আপনারা যে ধরনের নাটক শুরু করলেন একদম মিডলক্লাসের নাটক। দর্শক কীভাবে নিল?

যেহেতু আব্দুল্লাহ আল মামুন আমাদের নাট্যকার ছিলেন, সুতরাং আমাদের পছন্দ অনুযায়ী তিনি নাটক লিখতে পারতেন। দলের শক্তি অনুযায়ী। আমরা ঠিক করলাম চারপাশের ঘটনা যা আছে সেটা নিয়েই আমরা নাটক করব এবং অবশ্যই সেখানে মুক্তিযুদ্ধ একটা বড় উপাদান হিসেবে কাজ করবে। সে জন্যই তিনি 'সুবচন নির্বাসনে' প্রথম লিখলেন। একটা কথা আমরা সবসময় বলি যে, দুজন নাট্যকারের নাটকের ফলে বাংলাদেশের নব-নাট্যচর্চার ভীত অনেক শক্ত হয়েছে। একজন হচ্ছেন আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং আরেকজন হচ্ছেন মামুনুর রশীদ। বাংলাদেশের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তাদের নাটক অভিনীত হয়নি।

পরবর্তীতে দেখা গেল যে একটা 'থিয়েটার' ভেঙে তিনটা 'থিয়েটার' হলো। অন্য নামেও কয়েকজন দল করল। আপনার কি মনে হয় এই ভাঙনগুলো অনিবার্য ছিল নাকি সিদ্ধান্ত অন্যভাবে নিলে ঠেকানো যেত?

এখন মনে হয় যে সিদ্ধান্ত অন্যভাবে নিলে হয়তো ঠেকানো যেত। কিন্তু তখন মনে হয়নি। আসলে বেশিরভাগই হয়েছে ব্যক্তিদ্বন্দ্বে। প্রথম আমরা যখন কোরিয়া যাই তখন স্বাভাবিকভাবেই অনেককে বাদ দিতে হয়েছে। তখন তাদের মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কোরিয়া থেকে আসার পরে আস্তে আস্তে এটা দানা বাধতে শুরু করে। হঠাৎ করে একটা শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায় দলে। আমরা ঠিক করলাম যে দলের সদস্যদের আবার নতুন করে সদস্যভুক্ত করতে হবে। সেজন্য আমরা একটা পাঁচজনের কমিটি করি, বাকি সবাইকে আবার আমরা নতুন করে সদস্য পদে আনি। তখন দেখলাম হঠাৎ করে 'থিয়েটার' নামে একটা দল রেজিস্ট্রেশন করে। আরিফুল হকের নেতৃত্বে তারা কার্যক্রম শুরু করে পরবর্তীকালে। এখন আমাদের এটা খুব বিব্রত করে যে, থিয়েটার নামে তিনটা দল আছে, কিন্তু অন্য দুই দল ততটা সক্রিয় নয়। জিদ করে কখনো শিল্পচর্চা হয় না।

গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন গঠন করলেন ১৯৮১-এ।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমে মহিলা সমিতিতে আমরা 'ঢাকা নাট্য উৎসব' করেছিলাম। তারপর শিল্পকলা একাডেমিতেও একটা উৎসব করি। তখন থেকেই আমাদের মনে হয়েছিল যে বাংলাদেশের নাটকের দলগুলোর একটা প্ল্যাটফর্ম থাকা দরকার যেখানে সবাই মিলে কাজ করা যাবে। তখন আমি থিয়েটার পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে একটা সভা আহ্বান করলাম ১৯৮০-এ। টিএসসিতে হয়েছিলো সেই সভা। সেই সভার আগে মনে হয়েছিল যে, মামুনুর রশিদ একটু বিরোধিতা করতে পারে।

সেজন্য মামুনুর রশিদকে আমরা সভাপতি বানিয়ে দেই। যাই হোক, সেই সভায় সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা 'বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন' নামে একটা সংগঠন করব। সবার সম্মতি নিয়ে করার জন্য পরবর্তীতে আরেকটা তারিখ ঠিক হলো যে ঐদিন আমরা আরও বেশি মানুষকে আহ্বান করব। এভাবেই যাত্রা শুরু। ১৯৮১-এ প্রথম সম্মেলন হলো এবং ৬২টিরও বেশি দল সেখানে ছিল।

আপনার হাতে তো বাংলাদেশের অনেক সংগঠনের সূচনা হয়েছে। এই যে আপনার সংগঠকসত্তা, কখন মনে করলেন যে একজন সংগঠক হিসেবেই কাজ করবেন?

আসলে যখন দল করলাম, দেখলাম যে বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই অভিনয় করতে আসে কিন্তু সাংগঠনিক দিকে কারো কোন আগ্রহ নাই। সুতরাং অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্যই আমি সাংগঠনিক কাজগুলো নিজে করতাম। আমি একদিকে সংগঠন দেখতাম আর মামুন নাটকের অভিনয় শেখাতো। সেই থেকে আস্তে আস্তে আমাদের ফোকাসটা অভিনয় থেকে সংগঠনের দিকে চলে যায়।

এরপর আইটিআই শুরু করলেন কবে?

আইটিআই শুরু করলাম ১৯৮১-এ। কোরিয়াতে নাটক করতে গিয়ে প্রথম আমি আইটিআইয়ের কথা শুনলাম। সেখানে আইটিআই-এর জেনারেল সেক্রেটারি ছিল। তাকে বললাম যে, আমরাও বাংলাদেশে আইটিআইয়ের শাখা করতে চাই। তিনি বললেন, 'তোমাদের দিয়ে তো হবে না। তোমরা তো প্রফেশনাল থিয়েটার করো না।' উনার সঙ্গে তখন আর কথা হয়নি। পরে ঢাকায় এসে চিঠি চালাচালি শুরু হলো। আমি বারবার বলি যে, এটাই আমাদের লেজিটিমেট থিয়েটার। সুতরাং সেই অর্থে আমরা প্রফেশনালই। তো শেষ পর্যন্ত ওরা আমাদের কথা রাখলেন এবং আমাদেরকে অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপ দিলেন। তারপর চার বছর কি পাঁচ বছর অ্যাসোসিয়েট মেম্বার থেকে ফুল মেম্বার হলাম এবং ততদিনে আমরা আইটিআইয়ের কাজের মধ্যে যুক্ত হয়ে গেছি এবং যুক্ত হওয়াটা একটা সুযোগ ছিল আমার পক্ষে। আমি তখন ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিজ্ঞাপন করতাম। আমি চাইলে প্রতিবছর ওদের একটা টিকিট বিনা পয়সায় পেতে পারতাম। আমি সেই সুযোগ নিয়ে আইটিআই কংগ্রেসগুলোতে যেতাম। আর যখন আইটিআই এর থেকে কংগ্রেস উপলক্ষ্যে আমাদেরকে টিকেট দেওয়া হতো, সেই টিকিটটা আমি ফেডারেশনের যিনি চেয়ারম্যান ছিল তাকে দিতাম।

ওই সময় ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রযোজনায় আপনারা 'ম্যাকবেথ' করলেন থিয়েটার এবং নাগরিক যৌথভাবে। তারপর আবার গ্যাটে ইনস্টিটিউটে ঢাকা থিয়েটার করল 'ধূর্ত উই'।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে আমরা 'ম্যাকবেথ' করি। নাগরিক আর থিয়েটার মিলে। পরবর্তীতে করি 'টেম্পেস্ট'। দুটোরই অনুবাদ করেছিলেন সৈয়দ শামসুল হক। খুবই চমৎকার অনুবাদ। দুটোরই নির্দেশক খুব গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিস্টোফার স্যান্ডফোর্ড করলেন 'ম্যাকবেথ' এবং ডেলরা ওয়ার্নার তিনি এসে করলেন 'টেম্পেস্ট'। প্রথমে 'ম্যাকবেথ' নির্দেশনা দেওয়ার কথা ছিল ব্রিটিশ নির্দেশক রজার ক্রাউচারের। তিনি শেষ পর্যন্ত আসতে পারেননি কিন্তু তিনি কাস্টিংটা করে দিয়েছিলেন। ডেভরা ওয়ার্নার সবসময়ই নতুন ধরনের কাজ করতে আগ্রহী। যেমন টেম্পেস্টে 'এরিয়াল'কে একটা পুরুষ চরিত্রে সব সময় দেখা গেছে। ডেভরা ঠিক করলেন যে একটা মেয়েকে দিয়ে করাবেন। তিনি এটা ফেরদৌসী মজুমদারকে দিয়ে করালেন। এবং ডেভরা ওয়ার্নার বিশ্বাস করতেন যে, নাটকে যা কিছু ঘটবে মঞ্চের উপরেই ঘটবে এবং কোনো মিউজিক বাইরে থেকে করা হবে না। আমরা নিজেরাই মঞ্চে বসে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে মিউজিক তৈরি করতাম। কখনো খাকি কাপড় ঘষে, কখনো আবার এক্সরে প্লেট, কখনো আবার ব্রিটিশ কাউন্সিলের দেয়ালে নারকেল পাতা ঘষে ঝড়ের আবহাওয়া তৈরি করা। ওয়ার্নারের কাজটা আমাদের খুব ভালো লেগেছিল যে কিভাবে আমাদের নিজেদের সামর্থ্য দিয়ে নাটক করা সম্ভব, কিন্তু জোরটা হচ্ছে অভিনয়ের ওপর।

এমন আরেকটা প্রোডাকশনও করেছিলেন, লোক সমান লোক?

হ্যাঁ, এটা আমরা করেছিলাম জার্মান আইটিআইয়ের সহযোগিতায়। ফ্রিৎজ বেনেভিৎজ খুব বিখ্যাত একজন জার্মান নির্দেশক ছিলেন। তিনি ভারতে প্রায়ই আসতেন। তো তাকে অনুরোধ করাতে তিনি এসে 'লোক সমান লোক' নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

এরপর বোধহয় ১৯৯০ তে 'থিয়েটার স্কুল' শুরু করলেন।

ওইসময় আমরা ভাবলাম যে, থিয়েটার শেখার কোনো জায়গা নেই। কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিভাগ রয়েছে, কিন্তু সেখানে তো বিধিনিষেধ আছে সবাই যেতে পারে না। তো এভাবে আমরা দেখলাম যে একটা এক বছর মেয়াদী কোর্স যদি আমরা চালু করি, সপ্তাহে দুদিন ক্লাস তাহলে ভলোই হয়। তো সেই হিসেবে আমরা উদ্যোগ নিয়ে শুরু করলাম। এনএসডি এবং রবীন্দ্রভারতীর সিলেবাস দেখে একটা সিলেবাস তৈরি করা হলো এবং আমরা বিজ্ঞাপন দিলাম। প্রায় আড়াইশো ছেলেমেয়ে আবেদন করল। সেখান থেকে বেছে আমরা দুটো সেকশনে ২৫ জন করে মোট ৫০ জনকে ভর্তি করলাম। একটা পর্যায়ে এসে ফোর্ড ফাউন্ডেশন আমাদের কাজ দেখে আগ্রহ প্রকাশ করল। ওরা বলল যে, 'তোমরা এটাকে সপ্তাহে তিনদিন করো, আমরা তোমাদেরকে একটা ফান্ড দেবো। তো আমরা তিনদিন করলাম। ওদের ফান্ডে ঢাকার বাইরে ১৩টা শহরে তিনমাস মেয়াদী কোর্স করেছিলাম। সেগুলো অনেক বেশি কার্যকর ছিল।

গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন যখন তৈরি করলেন এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই তো তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময় বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং প্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে।

আমি তো মনে করি যে, একটা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে একবছর থিয়েটার ফেডারেশনের কর্মকাণ্ড স্থগিত রেখে। দেখা যেতে পারে কি হয়! আমার তো মনে হয় না তাতে কোনো ক্ষতি হতে পারে। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের অনেক ভালো কাজ আছে, কিন্তু তার মধ্যে একটা ক্ষতি হয়েছে আমরা নাটকের কিছু নেতা তৈরি করেছি যারা নাটক নিয়ে রাজনীতি করে, ক্ষমতা দেখায়। যাদের সাথে ক্রিয়েটিভিটির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। এটা করে করে ফেডারেশনটাকে একটা এমন জায়গায় নিয়ে গেছে এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। যার ফলে আমরা এখন লক্ষ্য থেকে সরে এসেছি।

পেশাদার নাট্যচর্চা বলতে যেটা বোঝায় বাংলাদেশে সেটা কখনো হয়নি। এই না হওয়ার কারণগুলো কী বলে মনে হয়?

যেভাবে চলছে তাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতেও এভাবে আমাদের দেশে পেশাদার নাট্যচর্চা হবে না। ভারতে যেমন আছে স্যালারি গ্র্যান্ট, সেটার মত করে কিছু একটা চালুর কথা বহুদিন ধরে বলে আসছি কিন্তু হচ্ছে না। যেমন আমি মনে করি যে, বছর বছর সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন দলকে অনুদান দেওয়া হয় ২০ হাজার টাকা থেকে ৬০ হাজার টাকা। এতে কিছুই হয় না। আমরা বারবার বলি যে প্রয়োজনভিত্তিক অনুদান দেয়া হোক। যেমন এবার ঠিক করা হোক যে, ২৫টা দলকে আমরা দুই লাখ টাকা করে দেবো নতুন প্রযোজনার জন্য। পরের বছর আবার অন্য দলকে দেবো। এভাবে করলে একটা কাজ হয়। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, এখন যে রেপার্টরি কোম্পানিগুলো হয়েছে এগুলো থিয়েটারের মতোই বিভিন্ন দল থেকে আসে। শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মানে কিন্তু একটা স্থাপনা। নাট্যশালার তো একটা নিজস্ব কোম্পানি থাকা দরকার। সেজন্যই আমরা প্রস্তাবনা করেছি যে ৩০-৩৫ জনের সাথে একটা দুবছরের বা তিন বছরের কন্ট্রাক্ট হতে পারে। যাদেরকে ফুলটাইমার হিসেবে নেওয়া হবে। তাদের কাজই হবে ফুলটাইম নাট্যচর্চা করা এবং প্রযোজনা নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া। এই কোম্পানির খরচটা মন্ত্রণালয় দিতে পারে, আবার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকেও দিতে পারে। বিদেশে যদি আমরা তাকাই দেখি যে, বেশিরভাগ ন্যাশনাল থিয়েটার বা অন্য প্রতিষ্ঠান বেসরকারি টাকায় চলে। সরকারি অনুদান আছে, আবার বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্পন্সরশিপে চলে।

বর্তমান সময় আশঙ্কাজনকভাবে নাটকের দর্শক কমে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে নাটকের দর্শক বেশিরভাগ এখন নাট্যকর্মীরাই। আরেকটা জিনিস খুব বেশি লক্ষ করা যায়–আমি আপনার দলের নাটক দেখে এসে বাহ্বা দিচ্ছি আবার আপনি এসে আপনার দলের নাটকের বাহ্বা দিচ্ছেন। আসলে কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না।

দর্শক যেমন আমাদের গ্রুপ থিয়েটারের আন্দোলনের খুব বড় অর্জন ছিল। আমরা নাটকের জন্য দর্শক তৈরি করতে পেরেছি আবার পরবর্তীকালে আমরা দর্শক আবার হারিয়েছি। এরও নানা কারণ আছে। একটা হচ্ছে যে, আমাদের দল অনেক বেড়েছে এবং অনেক নিম্নমানের নাটক তৈরি হয়েছে। যানজট ঢাকাতে একটা বড় সমস্যা। কোভিডের সময় দর্শক একেবারেই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তবে ইদানীং আবার ভালো নাটকের দর্শক তৈরি হচ্ছে। তবে যেটা বললে যে নাট্যকর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে বাইরের লোক আসছে না সেটা একটা ব্যাপার আসলে। এত নাটক হয় যে মানুষ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কোনটা দেখা উচিত আর কোনটা দেখা উচিত না, বা ভালো মানের কোনটা। যদিও ইদানীং বেশকিছু নতুন দল অনেক ভালো নাটক করে সেগুলো যদি সঠিকভাবে প্রচার হতো!

আমাদের নাট্যচর্চার বয়স ৫০ বছর পার হয়ে গিয়েছে। শুরুতে আমাদের নাটকে কোলকাতার একটা প্রভাব ছিলো এবং ধীরে ধীরে সেই প্রভাবটা কেটেও গিয়েছে। এই সময়ে এসে আমরা যদি দুই বাংলার নাট্যচর্চা নিয়ে একটু তুলনামূলক আলোচনা করতে চাই, সেক্ষেত্রে আপনি কী বলবেন?

কোলকাতার নাটকের কথাই যদি বলি, তাদের দীর্ঘদিনের একটা ঐতিহ্য, দেড়শ বছরের মতো হবে। আমাদের এখানেও একই সময় নাটক শুরু হয়েছিল। কিন্তু আমরা কোনো ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারিনি। কিন্তু কোলকাতাতে ধারাবাহিকভাবেই নাট্যচর্চা হয়ে আসছে। ওদের হলগুলো একোস্টিক খুব ভালো হওয়ার কারণে ওদের নাটক দেখলে যে পার্থক্যটা প্রথমে চোখে পরে সেটা হচ্ছে, ওদের বাচিক অভিনয়টা অনেক ভালো আমাদের তুলনায়। কারণ ওরা শব্দ নিয়ে খুব ভালোভাবে খেলতে পারে। আমাদের শিল্পকলা হওয়ার আগ পর্যন্ত মহিলা সমিতিতে চেঁচিয়ে অভিনয় করতে হতো। তবে স্বতঃস্ফূর্ততা অনেক আছে আমাদের নাটকে। কোলকাতার নাট্যদলগুলোর মতো নাট্যকার নেই আমাদের। সবচেয়ে বড় অক্ষমতা রয়েছে নাট্যকারের খামতি। যারা ৭০ এর দশকে ছিলেন সৈয়দ শামসুল হক, আব্দুল্লাহ আল মামুন, এস এম সুলায়মান সে জায়গাগুলো পূরণ করার মতো নাট্যকার এখন মাত্র সেই আমলের মামুনুর রশীদ আছেন। নতুন নাট্যকার তো সেভাবে গড়ে উঠছে না। আরেকটা দুর্বলতা আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে, এই বর্ণনাভিত্তিক নীতির নাটক। যার মধ্য দিয়ে নাটকের ক্ষমতার খর্ব হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমার কাছে মনে হয় যে, আমরা যে ধরনের নাটক করতে চাই তার পথে এটা একটা প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু আবার এর চাহিদা এখন অনেক বেশি, এখন অনেকেই সেটা পছন্দ করে। তবে এখনো ভারতের নাটক পরিচালকের নাটকের সঙ্গে আমাদের নাটকের ফর্মের একটা মিল হয়তো আছে। কিন্তু বিষয়বস্তু দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ, দুটো সমাজের আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি, দুটো সমাজব্যবস্থা আলাদা, সমাজ বাস্তবতাও আলাদা। কোলকাতাতে আজকাল প্রায় মুগ্ধ করার মতো প্রযোজনা দেখি।

কোলকাতার নাটকের দিকে যদি আমরা তাকাই, অনেক বৈচিত্র্য অনেক ধরনের ফর্ম নিয়ে কাজ করছে ওরা। বিভিন্ন ধরনের মুভমেন্ট হচ্ছে। যেমন প্রবীর গুহ অল্টারনেটিভ থিয়েটার করছে। আরো অনেকে অনেক ধরনের কাজ করছে। কিন্তু বিগত ৫০ বছরেও আমাদের দেশে এমন কিছুই হলো না।

আসলে আমরা রাস্তাঘাটে যতটা চিৎকার করেছি শিল্পে ততটা কনসেন্ট্রেট করিনি যে কিভাবে আমাদের নাটকটাকে নানাভাবে উপস্থাপন করা যায়। যেমন ছোট পরিসরের নাটক করা যায়, স্টুডিও থিয়েটারের মতো একটা জায়গাতে। যেখানে ৫০ জন লোকই হোক কিন্তু নাটক হোক। এই কাজগুলো করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি বলেই আমরা অল্টারনেট ফর্ম খোঁজার ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হয়েছি। অবশ্যই সেগুলো করা দরকার। তবে আমি নতুনদের ওপর খুব আস্থাশীল। আমি মনে করি, নতুনরা নতুন পথ বেছে নেবে।

এখন এই অনলাইন যুগে সব আর্ট এর ফর্ম কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। যেমন চিত্রকলার এক্সিবিশন এখন অনলাইনে হচ্ছে। থিয়েটারকেও এখন দর্শকের কাছে যাওয়া দরকার। দর্শককে ডেকে না এনে দর্শকের কাছে যাওয়া দরকার।

অপু মেহেদী
কবি ও নাট্যকার

মঞ্চনাটকের জীবন্ত মানুষের জীবন্ত অভিনয় দেখার যে আনন্দ তা আবার অনলাইনে গেলে নাও থাকতে পারে। দর্শকের কাছে যাওয়াটাই এখন বড় সংকট। তবে আমি মনে করি যে অভিনয়টা জীবন্ত হতে হবে সেটা যেভাবেই হোক। যেমন কলকাতায় আমি দেখলাম যে ট্রামের মধ্যে নাটক করে, এ ধরনের ইনোভেটিভ আইডিয়া আনা খুব দরকার। •

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ
ভারত বিচিত্রা

লেখা পাঠানোর নির্দেশনাবলি

ভারত বিচিত্রায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম, ব্যাংক একাউন্ট নাম, একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, ব্রাঞ্চের নাম ও রাউটিং নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। লেখার কপি রেখে নির্ভুল ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইলসহ আমাদের কাছে পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা অবশ্যই এমএস ওয়ার্ড (SutonnyMJ)-তে কম্পোজ করে দিতে হবে। সঙ্গে চেকবইয়ের ভেতরের পাতার ছবি তুলে বা স্ক্যান করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। তথ্যসমূহ ইংরেজিতে পূরণ করে ডাকযোগে বা ই-মেইলে পাঠান। অন্যথায় লেখা মনোনীত হলেও আমরা ছাপাতে পারব না। –সম্পাদক

ভারতীয় হাই কমিশন প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২। ই-মেইল: inf2.dhaka@mea.gov.in

Name :..... Pen Name :.....
Address :..... Bank Account Name :.....
..... Account No :.....
..... Bank Name :.....
Phone/Mobile :..... Branch Name :.....
e-mail :..... Routing No :.....

অনূদিত গল্প

মোগরা ফুল

নমিতা দাস
অনুবাদ : মুহসীন মোসাদ্দেক

‘কেমন আছেন?’ অল্পবয়সি এক মেয়ে বেঞ্চে বসে ভগবত গীতা পাঠরত পঞ্চাশোর্ধ মহিলাটিকে বলল।

বৃদ্ধ মহিলা তার চশমা ঠিক করলেন এবং পবিত্র গ্রন্থ থেকে চোখ তুলে উপরে তাকালেন। ‘তুমি কি আমাকে কিছু বলছ?’

মেয়েটি বৃদ্ধ মহিলার সামনে এসে দাঁড়াল, তার হাতের মুঠোয় বেশকিছু মোগরা ফুল। মেয়েটি এমনভাবে হাসল যেন সে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া কাউকে খুঁজে পেয়েছে।

‘কিছু মনে করো না, বেটা। আমাদের কি আগে কখনো দেখা হয়েছে?’ বৃদ্ধ মহিলাকে হতবাক এবং কিছুটা বিভ্রান্ত বলে মনে হলো। তিনি চশমার নিচে তার ভ্রু কোঁচকালেন।

বৃদ্ধ মহিলা বেঞ্চে নিজের আসন থেকে একটু সরে হাসিমুখো মেয়েটিকে পাশে বসার জায়গা করে দিলেন, তারপর বইটি বন্ধ করে কপালে স্পর্শ করলেন

সাদা মোগরার মিষ্টি ঘ্রাণ তারা শুঁকে দেখল। ‘এই সুগন্ধি এত পরিচিত; যেন এটা ইয়ের মতো, ওই যে ইয়ের মতো...’ বৃদ্ধ মহিলা মনে হলো শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি হাত দিয়ে চোখ চেপে ধরলেন

‘ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।’ তিনি বিড়বিড় করে বললেন, বইটি চুম্বন করে তার কোলের ওপর রাখলেন। ‘এটা বিব্রতকর, কিন্তু আমার মনে হয় না আমি তোমাকে চিনি।’

‘দয়া করে বিব্রত হবেন না। আমি বুঝতে পারছি বিষয়টা।’

‘তুমি কে?’

‘আমি এখানে আমার মায়ের সাথে দেখা করতে এসেছি।’ মেয়েটি তার ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল, কারণ সে বুঝতে পেরেছিল যে বৃদ্ধ মহিলাটি কতটা কৌতূহলী ছিলেন। ‘দুঃখজনক ব্যাপার হলো...’ সে একবার ঢোক গিলল, তারপর আবার বলতে শুরু করল, ‘তার ডিমেনশিয়া আছে এবং সে মাঝে মাঝে আমাকে চিনতে পারে না।’ তার ঠোঁট প্রসারিত হয়ে গেল যেন সে করুণভাবে হাসছে।

‘আমি দুঃখিত।’ বৃদ্ধ মহিলা মেয়েটির কাঁধে হাত রাখলেন। ‘ঈশ্বর তোমাকে শক্তি দিন।’

‘আমি তার জন্য এগুলো এনেছি।’ মেয়েটি তার হাতের মুঠো খুলে দেখাল।

সাদা মোগরার মিষ্টি ঘ্রাণ তারা শুঁকে দেখল। ‘এই সুগন্ধি এত পরিচিত; যেন এটা ইয়ের মতো, ওই যে ইয়ের মতো...’ বৃদ্ধ মহিলা মনে হলো শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি হাত দিয়ে চোখ চেপে ধরলেন। ‘তুমি জানো, বাড়িতে আমাদের সুন্দর ফুলেভরা বাগান ছিল। এমন সাদা মোগরা আর হলুদ গাঁদা। এছাড়াও, আমি লাল জবা ছিঁড়ে নিয়ে প্রতিদিন সকালে আমার বাড়ির মন্দিরে কালী মাকে অর্পণ করতাম। তারপর তুলসীর পাত্রে ধূপকাঠি রাখতাম।’

‘আর আপনিও কি আপনার এবং আপনার মেয়ের জন্য এই মোগরা ফুল দিয়ে গজরা বানিয়ে চুলের খোঁপায় পরেছেন?’

‘আমার মনে হয় আমি করেছি।’ বৃদ্ধ মহিলা চুপ হয়ে গেলেন। মেয়েটি তাকে ফুলগুলো দিতে চাইল, কিন্তু বৃদ্ধা সংকোচবোধ করছিলেন। ‘না! না! এগুলো তোমার মায়ের জন্য।’

‘সমস্যা নেই। আমি তার জন্য আরও নিয়ে আসতে পারব।’

বৃদ্ধ মহিলা ফুলগুলো শুঁকলেন এবং গভীর শ্বাস নিয়ে সুগন্ধ নিলেন। তাকে দেখে মনে হলো তিনি আবারও অন্য জগতে হারিয়ে গিয়েছেন। ‘জানো, আমার মেয়ে মোগরা ফুল ভালোবাসে। যখন সে ছোট ছিল, সে আমাকে এই ফুলগুলো দিয়ে খোঁপায় গোঁজার মালা বানিয়ে দিতে বলত এবং আমি তার বেণিতে ছোট্ট করে একটি মালা গুঁজে দিতাম।’

‘আপনি আপনার মেয়েকে অনেক ভালোবাসেন, তাই না?’

কথা বলার সময় বৃদ্ধ মহিলার চোখ চকচক করে উঠল। ‘অবশ্যই! কোন মা তা করে না? সে আজ আমার সাথে দেখা করতে আসবে। যদি আশপাশে থাকো তবে তুমিও তার সাথে দেখা করতে পারো।’

‘আমার বেশ ভালো লাগবে।’

দুইজন কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল, সেখানে সাদা সাদা মেঘ ভাসছে। তারপর বৃদ্ধ মহিলা আবার কথা বলতে শুরু করল। ‘তোমার নাম কী?’

‘অর্পিতা।’

‘অর্পিতা’ বৃদ্ধ মহিলা পুনরাবৃত্তি করলেন। ‘নামটা কোথায় যেন শুনেছি?’ তিনি নিজের মনে বিড়বিড় করে বললেন, তার চোখ অস্থিরভাবে এদিক ওদিক নড়তে থাকে। ‘ঠিক মনে করতে পারছি না।’

‘থাক, অস্থির হবেন না। এটা বেশ প্রচলিত একটা নাম।’ অর্পিতা উদ্বিগ্ন বৃদ্ধ মহিলার অস্থিরতা দূর করতে চাইল। ‘মনের ওপর বেশি চাপ দেওয়া ভালো না।’ সে বৃদ্ধ মহিলার কুঁচকে যাওয়া আঙুলগুলো ধরে আলতো করে তার বুড়ো আঙুল বোলাতে থাকল।

বৃদ্ধ মহিলা তার মুঠোয় ধরে রাখা মোগরা ফুলগুলো শুঁকল। মুহূর্তেই তার অস্থিরতা শিথিল হয়ে গেল বলে মনে হলো। ‘অর্পিতা, তোমার পরিবারে আর কে কে আছে?’

অর্পিতা উত্তর দেয়ার আগে চোখ বন্ধ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, ‘আমার কেউ নেই। আমি একা থাকি।’ সে বৃদ্ধ মহিলার দিকে ফিরে তাকাল। ‘আমার স্বামী এবং তিন বছরের ছেলে গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আমার দুর্ভাগ্য দেখুন; আমিই সেদিন গাড়ি চালাচ্ছিলাম, অথচ আমি এখনও বেঁচে আছি। ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন যেন নিজেকে তিরস্কার করে করে আমি প্রতিদিনই মরতে পারি। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি আমার পরিবারকে হত্যা করেছি।’

‘এভাবে বলো না, অর্পিতা। এসবে তোমার কোনো হাত নেই। ঈশ্বরই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক।’

‘আমার মা তার নাতির কথাও মনে করতে পারে না। এটি প্রতিবার আমাকে আরও বেশি করে আঘাত করে। আমাকেই তাকে বলে দিতে হয় আমি কে, তার জামাই কে, সে তার নাতিকে কতটা ভালোবাসত।’ অর্পিতা চোখের জল মুছল।

‘আমি নিশ্চিত তিনিও নিশ্চয় তোমার দুঃখ অনুভব করছেন।’ বৃদ্ধ মহিলা অর্পিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

‘আমি জানি না এভাবে কতদিন বেঁচে থাকতে পারব। আমার জীবন শূন্যতায় ছেয়ে গেছে।’

‘শোনো, অর্পিতা। যারা কষ্ট সহ্য করতে পারে ঈশ্বর তাদেরকেই বেশি বেশি পরীক্ষায় ফেলেন। তুমি শক্তিশালী এবং সাহসী মেয়ে; দেখবে, তোমার জীবনের সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।’

‘আপনি কীভাবে জানেন?’

‘আমি এমনিতেই জানি। আর আমি কালী মায়ের কাছে প্রার্থনা করব। আগামীকাল আমার সকালের প্রার্থনার সময় কিছু অতিরিক্ত লাল জবা অর্পণ করব। কালী মা সবসময় আমার প্রার্থনা শোনেন। তিনি তোমাকে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের আশীর্বাদ করবেন।’

‘আমিও এমনটাই প্রত্যাশা করি।’ অর্পিতা বৃদ্ধ মহিলাকে আবার তার হাতের মুঠোয় থাকা মোগরা ফুলগুলো শুঁকতে দেখল যেন ওগুলো কোনো মাদকদ্রব্য, তাদের সুবাস তাকে মাতাল করে দিচ্ছে।

দুজন আবার চুপ হয়ে গেল। সাদা মেঘগুলো এক এক করে ভেসে চলে গেল দূরে, অদৃশ্য হয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে, ডিমেনশিয়া আক্রান্ত কারও স্মৃতির মতো। সূর্য অস্তমিত হতে শুরু করার সাথে সাথে আকাশটির রং বদলে যেতে লাগল, অর্পিতার যন্ত্রণাদায়ক বর্তমানের সাথে যেভাবে তার ভুতুড়ে স্মৃতি মিশে গেছে, সেভাবে আকাশটাও যেন স্তরে স্তরে অস্তমিত সূর্যের আভার আলো-আঁধারি রঙের সাথে মিশে যাচ্ছে।

‘আমি কি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?’ অর্পিতা হঠাৎ বলে উঠল।

‘নিশ্চয়। বলে ফেলো।’

‘আপনার কি এমন কিছু মনে আছে যে, কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তা পূরণ করেননি?’

‘না, এরকম কিছু আমি করিনি।’ বৃদ্ধ মহিলা ভাবলেন। ‘আমি কখনো কোনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি বলে মনে হয় না। কিন্তু তুমি কেন আমার কাছে এসব জানতে চাইছ?’

‘আমার মা আমাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে।’ অর্পিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ‘আমি চাই যে একদিন তার এটা মনে পড়ুক।’

'আমার বিশ্বাস তার মনে পড়বে। তবে তুমি তার সাথে কথা বলতে পারো। হয়তো তার মনে পড়বে তাতে।' বৃদ্ধ মহিলা যুক্তি দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করল।

'হয়তো।' অর্পিতা আকাশের দিকে তাকাল।

বৃদ্ধ মহিলা তার ভগবদ গীতা খুললেন এবং চশমা ঠিক করে নিয়ে আবার পড়তে শুরু করলেন। খোলা পৃষ্ঠাটি পড়া শেষে, পাতা উল্টাতে তিনি তার আঙুল তুললেন এবং তার হাত থেকে মোগরা ফুলগুলো পড়ে গেল। তিনি নিচু হয়ে সেগুলো তুলে নিলেন। তিনি আবার সেগুলো শুঁকলেন। 'এগুলো কোথা থেকে এলো?' তিনি অবাক হওয়া চাহনিতে ফুলগুলোর দিকে তাকালেন এবং ছোট্ট সাদা পাপড়িগুলো স্পর্শ করলেন।

'এগুলো আমি তোমাকে দিয়েছি।'

'তুমি কে?' বৃদ্ধা অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকালেন।

অর্পিতা হতাশায় এবং বিরক্তিতে মাথা নাড়ল। 'আমি অর্পিতা, তোমার মেয়ে।'

'না, তুমি আমার মেয়ে নও।' বৃদ্ধা ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। তিনি চারপাশে তাকালেন। 'এটা কোন ধরনের রসিকতা? নার্স! নার্স!'

'তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছ। তাই না?'

'কীসের প্রতিশ্রুতি?'

'তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে কখনো আমাকে একা ছেড়ে কোথাও যাবে না, কিন্তু এখন তুমি এখানে ২৪ ঘণ্টা নার্সদের তত্ত্বাবধানে এবং যত্নে বাস করছ। তুমি আমাকে ছেড়ে এসেছ নিজের জন্য। তুমি আমাকে এই বিশাল পৃথিবীতে একা ফেলে রেখে চলে এসেছ। আমি বিয়ে করতে চাইনি, কিন্তু তুমি আমাকে বাধ্য করেছিলে। তারপর তুমি আমাদের বাড়িটা বিক্রি করে দিলে। ওটা আমারও বাড়ি ছিল। আমি ওই বাড়িতে বড় হয়েছি। আমি ওই বাড়ির সাদা দেয়াল, আমার গোলাপি বিছানা, সাদা মোগরা, লাল জবা, পুরো বাগানসহ ওই বাড়ির সবকিছুর সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। যত্তসব! আমি যখন ছোট ছিলাম তখন সেই ছোট ছোট বীজ বপণ করি এবং গাছগুলো আমার সাথে সাথে বেড়ে ওঠে। সেই মনোরম ঘরে আমি যেমন ফুল হয়ে ফুটে ছিলাম তেমনি ফুলগুলোও ফুটে ছিল। আর তুমি সব ধ্বংস করে দিয়েছ। কেন?' অর্পিতা বৃদ্ধ মহিলার ওপর ঝুঁকে পড়ে, দুজনের মুখের মাঝে মাত্র এক ইঞ্চি দূরত্ব ছিল।

'আমাকে যেতে দাও, প্লিজ। আমি বুঝতে পারছি না তুমি কী সব কথা বলছ। আমি তোমার মা নই। আমি তোমার বাড়ি বিক্রি করিনি।'

'চুপ করো! তোমার লজ্জা করে না, মা? বাবা তোমাকে ছেড়ে অন্য মহিলার কাছে চলে গিয়েছিল, কিন্তু আমি তোমার সাথেই ছিলাম। আজও মনে পড়ে সেই দিনগুলো; আমার বয়স মাত্র চার। তুমি কেমন করে কেঁদে কেঁদে মিনতি করলে, কিন্তু বাবা শুনল না। আমি ভয় পেয়েছিলাম তুমিও যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, কিন্তু তুমি কথা দিয়েছিলে আমাকে একা ছেড়ে কোথাও যাবে না। তবুও তুমি তা করেছ।' অর্পিতার চোখ লাল হয়ে গেল, শিরার ভেতর যেন রক্ত টগবগ করে ফুটছে। বৃদ্ধ মহিলার হাত থেকে ফুলগুলো ছিনিয়ে নিয়ে সেগুলো দুমড়েমুচড়ে দিয়ে রাগে ফুঁসছিল সে।

বৃদ্ধ মহিলা কাঁপছিলেন। 'আমি দুঃখিত, বেটা।' তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আমি তোমার সাথে এরকম কিছু করেছি কিনা মনে নেই। কিন্তু যদি করে থাকি, আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমি দুঃখিত যদি আমি তোমাকে কোনো আঘাত দিয়ে থাকি।' তিনি জোরে জোরে নিশ্বাস ফেললেন। 'সমস্যা সমাধানের জন্য আমি কি তোমার জন্য এখন কিছু করতে পারি?'

'তুমি আমার সমস্যাগুলোর সমাধান করবে?' অর্পিতা তার আঙুলের মাঝে ফুলগুলো পিষে দিলো। 'তুমি স্বার্থপর মহিলা। আমার জীবন ধ্বংস করে দিয়ে এখন তুমি আমার জন্য অনুতপ্ত।'

'প্লিজ বেটা, আমাকে এভাবে অভিশাপ দেওয়া বন্ধ করো। আমি কী করেছি তা সত্যিই মনে নেই। আমার কেবল এক ঝলকের মতো মনে পড়ে, একটি ছোট মেয়ে ফুলের বাগানে খেলছে এবং চুলের খোঁপায় গোঁজার জন্য মালা গেঁথে দিতে সে বায়না করছে। আমরা কিছু ফুল তুলেছিলাম এবং আমি ছোট্ট মেয়েটিকে শিখিয়েছিলাম কীভাবে মোগরার ছোট ডালপালা দিয়ে চুলের ব্যান্ড তৈরি করতে হয়। আমি কী করতে পারি?'

'আমাকে আমার বাড়ি ফিরিয়ে দাও।'

বৃদ্ধ মহিলা চারপাশে তাকালেন যেন কোনো একটি বাড়ি খুঁজছেন যা তিনি ফিরিয়ে দিতে পারেন। 'আমি তোমাকে সাহায্য করব; আমি...' তিনি কেঁপে উঠলেন। 'আমি আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলে বাড়িটা ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করব।'

'আমিই তোমার মেয়ে!' হাতের মুঠোয় মোচড়ানো ফুলগুলো মাটিতে ছুড়ে ফেলল অর্পিতা। 'তুমি তোমার মেয়েকে সবসময় ভুলে যাও কেন? তুমি খুব স্বার্থপর।'

বৃদ্ধ মহিলা বাতাসে নড়া গাছের পাতার মতো কাঁপতে লাগলেন। 'আমি দুঃখিত। কিন্তু তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন?'

'"দুঃখিত।" তুমি সারাক্ষণ কেবল এই একটা কথাই বলতে পারো।' অর্পিতা রেগে গেলেও হঠাৎ ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে। 'তুমি যেভাবে আমার স্বপ্নগুলোকে মেরে ফেলেছ সেভাবে আমি যদি তোমাকে মেরে ফেলি? তারপর যদি বলি, "ওহ, দুঃখিত।" কেমন হবে তখন?' সে হেসে উঠল। 'ঠিক আছে? দুঃখিত।' অর্পিতা বৃদ্ধ মহিলার আরও কাছে এগিয়ে গেল, মহিলার গলার দিকে হাত বাড়াল সে। ঠিক তখন একটি কণ্ঠ সেখানে ব্যাঘাত ঘটাল।

'মিসেস ব্যানার্জী। আপনার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে। চলুন।' বেঞ্চের পেছনে হুইলচেয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন নার্স।

'কিন্তু, আমার মেয়ে?' বৃদ্ধ মহিলা প্রথমে অর্পিতার দিকে এবং তারপর নার্সের দিকে তাকালেন, নার্সকে মনে হচ্ছিল যেন সে বিভ্রান্ত।

'ওহ। আপনার মেয়ে ফোন করেছিলেন; তিনি আজ আসতে পারবেন না।' নার্স বৃদ্ধ মহিলাকে তার আসন থেকে উঠে হুইলচেয়ারে বসতে সাহায্য করল।

বৃদ্ধ মহিলা অর্পিতার দিকে ফিরে তাকালেন, অন্য একজন নার্স তার সাথে কথা বলছে। তিনি তাদের কথা শুনতে পাননি। তিনি নার্সকে অনুরোধ করলেন তার মেয়ের সাথে কথা বলিয়ে দেওয়ার জন্য।

*****

'অর্পিতা–' ডাকলেন একজন নার্স। 'আপনি আবার বাগানে কী করছেন?' অর্পিতা মোগরা ফুল তুলছিল, সে জবাব দিলো না। 'তিনি আমাকে ঝামেলায় ফেলে দিবেন যেকোনো দিন। তার কারণে একদিন হয়তো আমি আমার চাকরিটা হারাব–' নার্সটি সাথে থাকা অন্য নার্সকে বিড়বিড় করে বলল। 'সেদিন, তিনি এক বৃদ্ধা ডিমেনশিয়া রোগীকে কী এক বাড়ি বিক্রি নিয়ে কী সব কাহিনি বলে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন; বৃদ্ধার মেয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, আমরা কীভাবে একজন সিজোফ্রেনিয়া রোগীকে পুনর্বাসনকেন্দ্রে অবাধে ঘুরে বেড়াতে দেই। আমি কীভাবে তাদের বোঝাব যে, ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখার মতো কোনো জন্তু তিনি নন?'

নার্স অর্পিতার দিকে তাকাল। সে হাসছিল, তার হাতের মুঠোয় একগুচ্ছ সাদা মোগরা ফুল।

[নমিতা দাসের জন্ম ভারতের মুম্বাইতে। তিনি একজন প্রযুক্তিবিদ, লেখক, ব্লগার এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েটর। কথাসাহিত্য, বিশেষত হাস্যরসাত্মক ধারা এবং ছোটগল্পের পাশাপাশি ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য ছবিসংবলিত-বইয়ের গল্প লেখার জন্য তার দক্ষতা রয়েছে। কাম্পালায় ভারতীয় হাইকমিশনার তাকে ইয়াং অ্যাচিভার পুরস্কারে ভূষিত করেন।

নমিতা দাসের প্রথম বই 'ইটস পুনি; উপস, আই মিন ফানি!' এরপর হরর এবং কমেডির মিশ্রণে লিখেছেন উপন্যাসিকা 'হু এট আওয়ার ফুড?'এরপর প্রকাশিত হয় তার দুটি ছোটগল্পের বই 'রিসেট, রিস্টার্ট, রিজিউম' এবং 'গ্রে রেইনবো লাভ'।

তিনি শিশু ও শিক্ষাগত মনেবিজ্ঞানে আগ্রহী। ছোটদের জন্য তার বই 'কিন লিটল কুকু' শিশু পাঠকদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য হয়েছে, এমনকি তাদের অভিভাবকদের কাছেও।] •

মুহসীন মোসাদ্দেক
গল্পকার ও অনুবাদক

বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (২৮ অগাস্ট, ১৯৭০ – ০৭ নভেম্বর, ২০১৫)

চলচ্চিত্র

প্রথাবিরোধী চলচ্চিত্রকার

বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শৈবাল চৌধুরী

শিল্পসৃষ্টিরত অবস্থায় একজন শিল্পী যদি জীবন থেকে বিদায় নেন, সেটা তাঁর কাছে অত্যন্ত ইপ্সিত এবং গৌরবের। মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে *সোহরা ব্রিজ* ছবির শুটিংকালে অবিরত বৃষ্টিতে ভিজে পরিচালক বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ভয়ংকর নিওমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। হেলিকপ্টারে কলকাতায় নিয়ে এসেও তাঁকে আর বাঁচানো যায়নি। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তাঁর অকাল প্রয়াণ ঘটে। দুঃখজনক সংবাদটি সেসময় সবাইকে হৃদয়ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। একের পর এক ব্যতিক্রমধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাপ্পাদিত্য সকলের কাছে প্রিয় পরিচালক হয়ে উঠেছিলেন। শেষ ছবি *সোহরা ব্রিজ* দেখলেই বোঝা যায় কি অন্তর্গত দক্ষতার মধ্য দিয়ে নিজেকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। *সোহরা ব্রিজ* দীর্ঘদিন নানান জটিলতায় আটকে ছিল

সম্প্রতি ছবিটি ইউটিউবের কল্যাণে দেখার সুযোগ হচ্ছে সকলের। বিষয় বৈচিত্র্য, ভিন্ন আঙ্গিকের চিত্রনাট্য, অসাধারণ সংগীত, স্বতস্ফূর্ত অভিনয়, কাব্যময় চিত্রগ্রহণ আর দ্রুতিময় সম্পাদনার সমন্বয়ে চমৎকার একটি চলচ্চিত্র–*সোহরা ব্রিজ*।

বাপ্পাদিত্যের চলচ্চিত্র যাত্রার সূচনা *সম্প্রদান* ছবিটি পরিচালনার মধ্য দিয়ে ১৯৯৯ সালে। প্রথম ছবিতেই জাত চিনিয়ে দিয়েছিলেন। তবে দ্বিতীয় ছবি *শিল্পান্তর* (২০০২) তাঁকে প্রাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভিন্ন ধরনের কাহিনি অবলম্বনে দেবশ্রী রায় ও শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ

অভিনয়ে সমৃদ্ধ এ ছবির সঙ্গীতাংশত ছিল চমৎকার। রাঢ় বাংলার অনন্য লোকসংগীতের অনবদ্য প্রয়োগ ঘটেছিল ছবিটিতে।

এরপর একের পর এক সিনেমা তৈরি করে গেছেন চলচ্চিত্র-অন্তপ্রাণ এই চলচ্চিত্রী। বলতে গেলে বিরতিহীন ভাবে। সবকটি ছবিতে তাঁর মৌলিক ঘরানা লক্ষণীয় হলেও প্রতিটি ছবি বিষয়গত দিক থেকে স্বতন্ত্র এবং নির্মাণ বৈচিত্র্যে অনন্য। বাংলাদেশে বাপ্পার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে *শিল্পান্তর* ছবির সূত্রে। এ ছবির সিডি (তখনও ডিভিডি তেমন প্রচলিত হয়নি) সারা বাংলাদেশে সে সময় ছড়িয়ে পড়ে। ছবিটির অসাধারণ সংগীত এবং বিচিত্র আখ্যানভাগ সাধারণ ও প্রাগ্রসর উভয় শ্রেণির দর্শককে বিমোহিত করেছিল। আমরাও অবাক নয়নে আবিষ্কার করেছিলাম শক্তিশালী ও শিল্পনিবেদিতপ্রাণ এক চলচ্চিত্রকারকে। কিন্তু ৪৫ বছর বয়সে তাঁর অকালপ্রয়াণ সে অগ্রযাত্রাকে মাঝপথে থামিয়ে দেয় ২০১৫ সালে।

বাপ্পাদিত্য ৪৫ বছরের অসমাপ্ত জীবনে নির্মাণ করে গেছেন ৯টি চলচ্চিত্র। প্রতিটি চলচ্চিত্রই নির্মাণ নৈপুণ্যে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটি ছবি তৈরির সময় তিনি সে কি পরিমাণ পরিশ্রম করতেন সেটা ছবিগুলো দেখলেই বোঝা যায়। শেষ ছবি *সোহরা ব্রিজ* (২০১৬) নির্মাণের সময় তিনি মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে বিরামহীন বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে শুটিং করেন। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে। এই ধকল তাঁর শরীর সইতে পারেনি। *সোহরা ব্রিজ* আমরা যখন দেখি, একজন চলচ্চিত্র নির্মাতার পরিপক্বতা ও দায়বদ্ধতার বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। পিতা-মাতার কন্যার গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি মেঘালয়ের ভূবৈচিত্র্য, বাংলাদেশ সীমান্তের নানা অনিয়মের চিত্র, অভিবাসন সংকট, স্থানীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের চিত্রগুলো খণ্ডখণ্ড চিত্রের সমন্বয়ে চিত্রনাট্যে নিপুণভাবে গেঁথে নিয়েছেন। সুগ্রন্থিত চিত্রনাট্যকে কাব্যময় চিত্রগ্রহণ এক চিত্রসুষম মণ্ডিত চলচ্চিত্রে পরিণত করে তুলেছে। পাশাপাশি পিতা কন্যার সম্পর্কের টানাপড়েন আমাদের মনকেও আর্দ্র করে তোলে। তাঁর অন্যান্য ছবির মতো *সোহরা ব্রিজের* সংগীতও ছবিটির একটি মুখ্য চরিত্র হয়ে ধরা দেয়। মেঘালয়ের পাহাড়ি সংগীতের পরিমিত ও সুপ্রযুক্ত প্রয়োগ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যময়তার সঙ্গে মিলে মিশে এক শ্রুতিনন্দন আবহ তৈরি করতে সমর্থ হয়।

আরেকটি ছবির কথা বিশেষভাবে বলা যায়। *কাঁটাতার* (২০০৪), বাপ্পার তৃতীয় ছবি। ছবিটিকে নানা কারণে দুঃসাহসিক বলা যায়। বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের কাঁটাতারকে রূপকার্থে তিনি ব্যবহার করেছেন এক অসহায় নারীর জীবন সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে। তরুণী এই নারী জীবন ধারণের প্রয়োজনে নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। পুরুষের প্রলোভনের শিকার হয়। ব্যবহৃত হয়। তবুও সে ভেঙে পড়ে না। জীবন যুদ্ধে যুঝে যায় ক্রমাগত। এর পাশাপাশি এ ছবিতে বিভিন্ন কৌতুকাবহের খণ্ডচিত্রে বাপ্পা সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও রাজনৈতিক নানা অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও ভণ্ডামির অসারতা তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশ ভারত সীমান্তবর্তী নিয়ম-অনিয়মের জীবনযাত্রাও বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রায়িত হয়েছে এ ছবিতে। ছবিটির সংগীতও অসাধারণ। দুই বাংলার লোকসংগীত, বিশেষ করে চট্টগ্রামের মাইজভান্ডার সংগীতের অপূর্ব এক সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে *কাঁটাতার* ছবির আবহ ও কণ্ঠসংগীত রচিত হয়েছে যা পুরো ছবিকে এক ভিন্ন ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছে। ছবিটি ফ্রান্সের ভেসুলে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভেলে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার পায়।

২০০৬ সালে ঢাকা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে *কাঁটাতার* এন্ট্রিভুক্ত হওয়ার পর সাহসী কিছু দৃশ্য ও বক্তব্যের কারণে আয়োজকেরা ঢাকা উৎসবে ছবিটি প্রদর্শনে একটু ইতস্তত করছিলেন। চট্টগ্রাম উৎসবের আয়োজকেরা ছবিটিকে উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবে নির্বাচিত করেন। চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউটের বিশাল মিলনায়তনে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ দর্শক ছবিটি সানন্দে উপভোগ করেন। প্রদর্শনীতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছবির অভিনেতা ইকবাল সুলতান ও সংগীত পরিচালক দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। চট্টগ্রামের মাইজভান্ডার শরীফের বিভিন্ন ওরশে যোগ দেয়ার জন্য দূর দুরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা বাসে বা ট্রাকে চড়ে স্বকণ্ঠে নানা মারফতী গান গেয়ে বা রেকর্ডারে গান বাজিয়ে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ রকমের একটি দৃশ্যকল্প *কাঁটাতার* ছবিতে আছে। প্রসঙ্গটির অবতারণা করলাম এজন্যে, পরিচালক বাপ্পাদিত্য বিভিন্ন এলাকার লোকজ ও মরমি সংগীত এবং তার পরিবেশনের বিষয়ে কতটুকু ওয়াকিবহাল ছিলেন সেটা বোঝাতে। লোকজ সংগীতের প্রয়োগসমৃদ্ধ আরেকটি ছবি *শিল্পান্তর*।

বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ে অন্যান্য ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে; *দেবকী* (২০০৬), *কাল* (২০০৭), *হাউজফুল* (২০০৯), কাগজের বউ (২০২১), *এলার চার অধ্যায়* (২০১২), *নায়িকা সংবাদ* (২০১৩)। *সোহরা ব্রিজ* (২০১৬) তাঁর শেষ ছবি। স্বভাবতই সবকটি ছবির নির্মিতিতে পরিচালকের নিজের মেকিং স্কুলিং বা ঘরানাটা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিষয়বৈচিত্র্য ও ছবিগুলো গড়ন এবং গঠনগত দিক দিয়ে প্রতিটি ছবিই স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ছবিগুলোর মধ্যে *হাউজফুল* যুব সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল।

বাপ্পাদিত্য তাঁর ছবিতে যেন সব কথা বলতেন না। দর্শককে বুঝে নেয়ার সুযোগ দিতেন। সংলাপের চেয়ে দৃশ্যময়তার ওপর জোর দিতেন বেশি। ছবিগুলো দর্শককে কখনো চরম উত্তেজিত করে তুলত, শিরদাঁড়া সোজা করে সটান করে তুলত, অথচ কোনো উচ্চবাচ্য নেই ছবির কোথাও। এক্ষেত্রে ক্যামেরার পাশাপাশি অভিনয়ের একটি মুখ্য ভূমিকার প্রয়োজন যা বাপ্পার সব ছবিতেই লক্ষ্যণীয়। এবং সংগীত। সংগীত তাঁর চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান চরিত্র। প্রতিটি ছবিতেই তিনি সংগীত নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন যা ছবিগুলো দেখলেই বোঝা যায়। এক্ষেত্রে অবশ্যই তাঁর সংগীত পরিচালকেরা তাঁকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়েছেন একথা মাথায় রেখেও বলা যায়, পরিচালকের সাংগীতিক বোধটা অত্যন্ত জরুরি। একটি ফিল্মের বেস টোন হচ্ছে মিউজিক। প্রতিটি ছবিই একেকটি মিউজিকাল জার্নি। পরিচালকের সাংগীতিক বোধ ও সংগীত পরিচালকের দক্ষতার সমন্বয়ে এই টোন ও জার্নি তৈরি হয়।

ক্যামেরাও বাপ্পার ছবির মেরুদণ্ড। তাঁর ক্যামেরা সব সময় সঞ্চরণশীল। বিশেষ করে ল্যান্ডস্কোপ সিনেমাটোগ্রাফি তাঁর ছবির আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা তাঁর ছবিগুলোকে কাব্যময় করে তুলত।

আন্ডারওয়ার্ল্ড পারিপার্শ্বিকতাকে তিনি তুলে ধরতে আগ্রহী ছিলেন। *কাঁটাতার* ও *সোহরা ব্রিজে* এটা বিশেষভাবে দেখা যায়। তবে মজার ব্যাপার হলো, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অন্তর্জগতের সমান্তরালে বাপ্পা তাঁর ছবিতে মানুষের মনোজাগতিক অন্তর্জগৎকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করতেন, যে জগতে রয়েছে মানুষের নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা, নিরন্তর ভীতি ও জীবন ঝুঁকির চিত্র। পরিবেশ বস্তুত দুই অন্তর্জগতের একই রকম। এই পরিবেশ প্রতিবেশের চিত্র তাঁর অনেক ছবিতে আমরা দেখি।

বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৭০ সালের ২৮ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়িতে। বেড়ে উঠেছেন সিউড়ি ও লাভপুরে। দুটোই রাঢ়বঙ্গের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ অঞ্চল। বাপ্পাদিত্যর পিতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রথিতযশা সাহিত্যিক, প্রামাণ্য চলচ্চিত্রকার ও সম্পাদক। শিশু পত্রিকা *আনন্দমেলার* সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন দীর্ঘদিন। চলচ্চিত্র সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সঙ্গেও সংযুক্ত ছিলেন। বাপ্পাদিত্যর মা মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায়ও একজন সংস্কৃতিবান গৃহিণী। বাপ্পার ছোটভাই রাজাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন প্রামাণ্য চলচ্চিত্রকার। কাহিনিচিত্র নির্মাণেও তিনি যুক্ত। সবমিলে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার সাংস্কৃতিক বিশেষ করে চলচ্চিত্রিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ও লালিত। তবে বাপ্পাদিত্যর অকাল প্রয়াণ পুরো পরিবারকে অনেকটাই হতোদ্যম করে দিয়েছে।

একজন শিল্পীর পরিপক্ব হয়ে ওঠার যে বয়স ঠিক সে বয়সে, মাত্র ৪৫ বছরে বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণ ঘটে ২০১৫ সালের ৭ নভেম্বর কলকাতায়। এই লেখার শুরুতেই বলা হয়েছে, মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজে সোহরা ব্রিজ ছবির শুটিং এর সময় তিনি কঠিন নিওমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। কলকাতায় নিয়ে এসে চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেই তিনি সোহরা ব্রিজের সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সম্পাদনার শেষে আবারও নিওমোনিয়ায় আক্রান্ত হন তিনি। চিকিৎসা করেও তাঁকে আর বাঁচানো যায়নি। একটি অপার সম্ভাবনাময় জীবনের অসমাপ্ত যাত্রা ঘটে।

অপ্রত্যাশিত এই অসম্পূর্ণতা প্রতিভাবান একজন চলচ্চিত্রকারের অবিরাম অভিযাত্রাকেই কেবল মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছে তাই নয়, বাধাগ্রস্ত করেছে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথাবিরোধী এক নির্ভীক পথচলাকে। •

শৈবাল চৌধুরী
লেখক, শিক্ষক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা

ব্রতী মুখোপাধ্যায়

দুইখানি পদ

১
পাশ ফিরছে নদী
কুচোমাছ কত, সবেমাত্র ডিম ছেড়েছে

হাঁ করে তাকিয়ে পাঁচটা সাতটা বক
মাটির নিচের কেঁচো, উপরে অজচ্ছল সবুজ

পাশ ফিরছে নদী
একটা দুটো তিনটে চারটে কী সব পাখি
পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ উড়তে উড়তে দেখল

এমনও তাহলে ঘটে
নদীতে তেমন জল নেই, তা সত্ত্বেও

২
জল সরে যায়, মানুষজনও
জল কাছে আসে, মানুষজনও

কখন কী যে ঘটে

জল গড়ায়, স্বভাব
শুকিয়ে যায়, রোদের তাত যা

মানুষের কী যে ঘটে
জল চেনার নাম নেই, রোদ চেনার নাম নেই
নিজেকেই চেনা হয় না, ঠিকঠিক কখনো চেনা হয় না

শংকর চক্রবর্তী

গাছের সংসারে

গাছগুলি নীচু হয়ে বুঝি বলে গিয়েছিল কিছু
অতিরিক্ত শব্দ শোনা যেত বাতাসেরই–
একমাত্র নীলরঙা পাখি
দেখতে পেয়েই তুমি হারিয়ে গিয়েছ
ফিরোজা বেগম গান গাইতেন বহু দূর থেকে
পাখিদের গাছগুলি ঘর-বাড়ি সংসারসমেত
বারবার নীচু হয়ে বিকেলে সুরের দিকে হেঁটে যেত একা
কতটা তুমুল কার্যকরী
মৌসুমী আলোয় দেখে নিয়ে
দিগন্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে
তোমার অধিক লজ্জা তাই গাছগুলি ছুঁয়ে দেখে নিলে তুমি
তোমার নিজস্ব জামা নেই
আত্মীয়-বন্ধুর জামা ঝোলে গাছে গাছে
বোবা গাছগুলি আজও মাথা নীচু করে ঝুঁকে থাকে কীরকম
গাছেদের বারান্দায় ঝিনুক-ঢাকা রোদ্দুর নেমে আসে দ্রুত।

বিনয় কর্মকার

কবি ও তৃতীয় সূত্র

মূল-সংখ্যার চেয়ে চিরকাল কম হয় বিয়োগফল,
আর জীবন খেয়ে খেয়ে বেঁচে থাকে কবিতার
প্রতিটি হরফ।

যে পাখায় উড়ালের এত আয়োজন; সে পাখাই
পুড়ে যাওয়ার হাজার প্রবাদ।

জ্ঞান বিতরণে কমে না জানি,
তবু সলতে পোড়া আলোর কাহিনি কি মিছে?
প্রস্থ বৃদ্ধি মানেই তো নদীর পাড়ভাঙ্গা ইতিহাস।

কামরুল ইসলাম

একটি নতুন সিঁড়ির বায়োগ্রাফি

রাতের সারাংশ যে জোনাকিরা, তার ফুটনোটে
দাঁড়িয়ে আমি দেখে যাচ্ছি, ঘোর সন্ধ্যায়, মাধবীরা
কিভাবে চাঁদপাখি হয়ে যায়;
সিঁড়ি নেই, তবু তুমি উঠে যাচ্ছ সড়াসড়
বাতাসের হুহুতে পা রেখে রেখে–
সন্ধ্যার ঝড়ো-হাওয়ায় আটকে থাকা সিঁড়ির
হাহাকারটুকু সাথে নিতে ভোলোনি, তবুও;
তুমি চেনে গেছ সিঁড়ি ও অন্ধকারের পার্থক্য,
তুমি জেনে গেছ, ডুবোচরের তৃতীয় নয়ন
শুকনো বাঁশপাতার অসামান্য গজল–
ভোরের বৃষ্টিতে একটি উপমার হুইসেল শুনে
পাখিরা ডালে ডালে সঙ্গম রেখে পালিয়েছে,
তুমি সেই ফেলে যাওয়া রতিছায়ার আলোয়
একটি নতুন সিঁড়ির বায়োগ্রাফি
নিমডালে টাঙিয়ে, পড়ে যাচ্ছ নৈঃশব্দ্যের চিত্রল ছায়ামুখ–

মনিরুজ্জামান মিন্টু

বাবা

বাড়িতে কেউ নেই, এ বাড়িতে আর কেউ থাকে না।
পুরাতন দেয়ালের পলেস্তারায় আঁচড় পড়েছে
নতুন রঙের, খুঁজে বেড়াই তার স্পর্শ
ধুলোয় জমা পড়া আলোকচিত্র তুলে রাখি গোপনে।

এ বাড়ির উঠোনজুড়ে বৃক্ষ আর বাগানের গল্পে
যত্ন আর মায়ায় জাল বুনে যায় পাতাদের সংসারে।
প্রবল বৃষ্টির ঘ্রাণে মাঝরাতে হেঁটে বেড়াও
তোমার প্রিয় উঠোনে, বৃষ্টির শব্দে তোমার
পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়, আমি বিদ্যুতের ঝিলিকে
তোমায় মিলিয়ে যাওয়া দেখি, ঝরে যাওয়া পাতায়
মনোবেদনায় রেখে যাওয়া ফড়িঙের গল্প আর গল্পে।

বাবা নেই, নেই তো নেই, কোথাও আর নেই।

অঞ্জনা সাহা

অবিন্যস্ত

বিষণ্ণ দিনের শিয়রে ফুটে থাকে
অবিন্যস্ত কিছু হার্দিক ঘাসফুল।
আহা ঘাসফুল, বড় ভালোবেসে ফুটেছ হে,
হৃদয়ের খুব কাছিকাছি।
সন্ধ্যার আঁধার ঘিরে শিশিরে যে স্নানের খেলা
চলে নিরন্তর–সবুজ পাতায়, ঘাসে–
তার কোনো তুলনা চলে না জানি।

দিনাবসানে জোনাকপোকার ঝাঁক
নেচে বেড়ায় পাতার আড়ালে।
তার আনন্দ জানে অন্ধকার রাত্রির নিশ্চিন্তপুর।

লক্ষ্মীপেঁচার নিদ্রাহীন চোখ অন্ধকারে জ্বলতে দেখেছি;
তার চোখের ভাষায় কিসের নালিশ ছিল,
জানা হয়নি আজও।

জ্যোতি পোদ্দার

নিশান

নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলেও একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখি
আমি মোর্চার ভেতর লাফাচ্ছি।

এত এত ভিড় আর হল্লা আর চলন্ত সব হাটবাজারের
পাতলা কুয়াশা।
কোথাও কোনো স্থিরচিত্র নেই।
মোর্চার ভেতর দলা পাকানো জটে জটিলে জটিলেশ্বর।
অথচ আমি নেই।
ভিড়ের ভেতর আমি নেই।
আমি অনেক দূরে–একাকী নিশান
পতপত করে বাতাসে কাঁপছি উঁচু বাঁকা বাঁশের মাথায়।

নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলেও নিজেকে দেখি মোর্চার ভেতর।
মোর্চার ভেতর ব্যাঙাচি আমি একাকী নিশান পতপত করে উড়ি।

অমিত সাহা

চন্দ্রাবলী-দাগ

প্রথাগত প্রেম বাক্যহীন হতে চায়
বরফের সংজ্ঞা লিখে রেখেছে উত্তাপ
জলের নীরব নীরবে সেরেছে দায়
গলনাঙ্ক মাপে চেতনার অভিশাপ।

দায়ভার নেওয়া ঘরে ফেরা পাখি জানে
আকাশ পথে যে আনমনে তারা গোনে
সহজ সংসারে নদীটির কথা মানে
বৃক্ষযুগল তো ছায়ার কথাই শোনে!

ছায়া কায়া মিশে নিমেষে গড়েছে বিশ্ব
জমে থাকা প্রেমে গোধূলিবেলার রাগ
প্রতিটি বরফ অভিমানে হয় নিঃস্ব
জলের গভীর ক্ষতে চন্দ্রাবলী-দাগ!

পদাবলি প্রেমে ঠোঁটময় অভিমান
রাধার ছায়ায় অশ্রুকাতর আয়ান

ফিরোজ আহমেদ

পেট

আমাদের সকল সূর্যমুখী পেছনে চলে যায়
শ্রাবণে পদ্মর বিল
লাল-শাপলার বাঘিয়া আমার
পায়ের সাথে মাত্রা মেলে না।
আজকাল!
মধ্যবিত্তের পা হতে মাথা অবধি
শুধুই যেন পেটের উপস্থিতি।

পাহাড় হতে মুছে ফেলার পর
বুদ্ধ বসে আছেন মাথার ভেতরে
তবু মাথাটাকেও খুঁজে পাই না আজকাল।

কেবলই মুখ থেকে পায়ুপথ
কেবলই রেসের ঘোড়া।
সরে সরে যাচ্ছে জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত,
খাঁচাহীন পাখির কলরব।

আমাদের সমস্ত সময়
বিক্রি হয়ে গ্যাছে চাল-ডাল-আটার দামে
অথচ আমাদের গ্রন্থাগারের নব্বুই লাখ ফুল
ছাই হয় তরবারির আগুনে।

বাগানে সূর্যমুখীর নন্দন নাই
চাষের জমিতে যা ফুটে থাকে
সেখানে শুধু তেলের যোগান
পেট থেকে মাথায় উঠছে না কিছুই।

পাপড়ি গুহ নিয়োগী

রোয়াক

প্রেমে পড়ার আগে বুঝতে পারিনি
চিতার দিকে যাচ্ছি

বুঝতে পারিনি
চোখ বন্ধ করেও তোমাকে দেখা যায়

এবার নিজেকে পোড়ানোর পালা

সুমন শাম্‌স

অন্ধর বিবিধ স্বস্তি

দৃষ্টির ভয় নিয়ে কারো চোখ ভেদ করার যাতনা তার কোথায়?
অন্ধ এক পাথরের নাম। জিঘাংসার সত্তা দাঁত তুলে হাসলেও
অন্ধ কি জানে–অন্ধের লোভ-ক্ষোভ-ঘৃণা-মোহ-মাৎসর্য নেই?

স্বপ্নের আঁধারে দেখে না জন্মান্ধ প্রেম অথবা প্রতিহিংসার মুখ।
গভীর অন্ধকারের ভেতর ডুবে থাকে অপ্রকাশিত স্বপ্ন তার।
বন্ধু অথবা শত্রুর মুখ সেসব অন্ধকারে ঢেকে থাকে।
আঙুলের চোখে জন্মান্ধ খুঁজে নেয় ভালোবাসা ও সকল ঘৃণা।

মাসুদার রহমান

সিঁড়ির ল্যান্ডিং ও প্রজাপতি

প্রজাপতি হত্যার দায় কেন নাওনি!

সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে দেখা হলে
জানি, কিছু বলতে চেয়েছ

বলতে পারোনি

যতবার বলবার চেষ্টা করেছ
তোমার জিভের ডগায়
উড়ে এসে বসেছে এক প্রজাপতি

নীলাদ্রি দেব

জ্যোৎস্না খাওয়া মাছের বাগান

এক.
অন্ধকারের চোখে চোখ রাখে মাঝি
চুপ একটা চিৎকার গাঢ় হয়
টান খাওয়া স্রোতের নামতা শুনি
ঘাই দেয় সময়ের প্রাচীন পোশাক
সৌখিন রাত বিস্ময়ে কুয়াশা
মাছের পিঠ জ্বলে ওঠে পূর্ণিমায়
অথচ খুঁজি, খুঁজি, আবারও খুঁজি
জানি মাছ দেখছে, মানুষের আঁশটে গন্ধ

দুই.
জ্যোৎস্নায় ডুবসাঁতারে পৃথিবী স্পর্শ করে
সহজে বিশ্বাস করে না গুপ্তহত্যার গান
মাছের জন্য রাখা মাছের দেহ, টোপ
অস্বীকার করে
তবু আলোর পেছনে অসমর্থ শিকারি
যতটা সমর্পণ দেখে, ভুল অংক
ওর তীক্ষ্ণ আমাদের জিভে বিঁধে আছে

কুমকুম দত্ত

পাঠশূন্যতার দিকে

ঝরাপাতা হাহাকার পাঠ শূন্যতার দিকে
কুয়াশা ধীরে ধীরে
পিছনে ধাবমান সময়
পথ পরিধি বাড়ে দূরত্বের
চোখে জল ক্রন্দন কোলাহল
ঠিকানা জন্ম-মৃত্যুর;
অন্ধকার গহ্বরে রাত হাত ইশারায়
ছেঁড়াপাল জীবনের নদী গভীর;
অজ্ঞাত ভ্রমণে নিরবধি
পাশাপাশি অজানা বয়ে যায়।

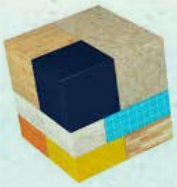

অরবিন্দ চক্রবর্তী

দর্শক

আর যা দেখলাম, তাই দেখলাম দেখার পর যা দেখা গেল ওসব
ঘটছে দেখকদের অস্ত্রের পর

আসলে কী দেখলাম?

একটি ডিম্ব পুষছে ওই ডিম্বের মা
ফুটছে হাস, চন্দ্রবিন্দু ছাড়া তথাপি সতর্ক টাকা
বীজ দেখলাম কিংবা বোমা যা একদিন স্বপ্ন লংঘন করে
তোমার উঠোনে তোতাপাখি কথার পর কথা দেখাচ্ছে

এমন নীলচে যেন সে লাল
বোঝে অথচ বিশারদ অথচ বৃষ্টি মাথায় করে ফিরছে বাবুই
বাসার দিকে

একদিকে ধারাডানা জ্যোৎস্না, অন্যদিকে বাস্তবাহিক প্রতিদিন

কোন দিকে? দেখা যাক।

রাজেশ চন্দ্র দেবনাথ

বিবর্তিত আওয়াজ

শ্মশান যাত্রা শেষে
সংসারের সাংস্কৃতিক পর্দায়
আলুথালু ভাবনার স্ফুরণ

জ্যোৎস্না মালায় জম্পুই সবুজ হাড়ে
বিবিধ ধ্বনিতে লালিত হয়
একাকিত্বের সম্ভাবনা...

যেভাবে প্রতিবাদের ঘাসে বিপর্যয়
স্রোতের টানে থমথমে
উদাসীন গল্পগুলো...

সব গল্পই যেন বিবর্তিত আওয়াজ
কৌতূহল আর জোনাকির প্রতারণা
ধুয়ে নেয় মরীচিকার ঘোলাটে মলাট

এস এম কাইয়ুম

পরমান্ন

বাঁধ বাঁধতে এসে ভেঙে পড়ো জলের ঢেউ! তোমাকে না পেলেই
যেন পাই। আমি জাগলেই জেগে ওঠো তুমি; তোমারও তো ঘুম পায়
জাগার অভ্যেসে! ...অথচ প্রাপ্তিও এক ধরনের বাহ্যিক বন্ধন;
ভেতরে অপ্রাপ্তির দহন

শূন্যতার তিন মাত্রা থেকে আরেক শূন্যতায় দাঁড়িয়ে,
'যদিদং হৃদয়ং তব/তদিদং হৃদয়ং মম'
সুজাতারা তখনও পায়েসের বাটি হাতে অপেক্ষারত/অপেক্ষমাণ, প্রতীক্ষা করে
তারপরে বীজ ও বপন ক্রিয়ার দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে

ফলিত ফসল উঠে গেলে গৃহের সন্ন্যাসে, আমিও সিদ্ধার্থের মতো একা পুরুষ;
নিঃসঙ্গ জ্যোৎস্না রাতে আঁধারের শামুকবাসে আলো জ্বালি, অপেক্ষা করি,
প্রতীক্ষা করি, তারপরে ঘুমিয়ে পড়ি!

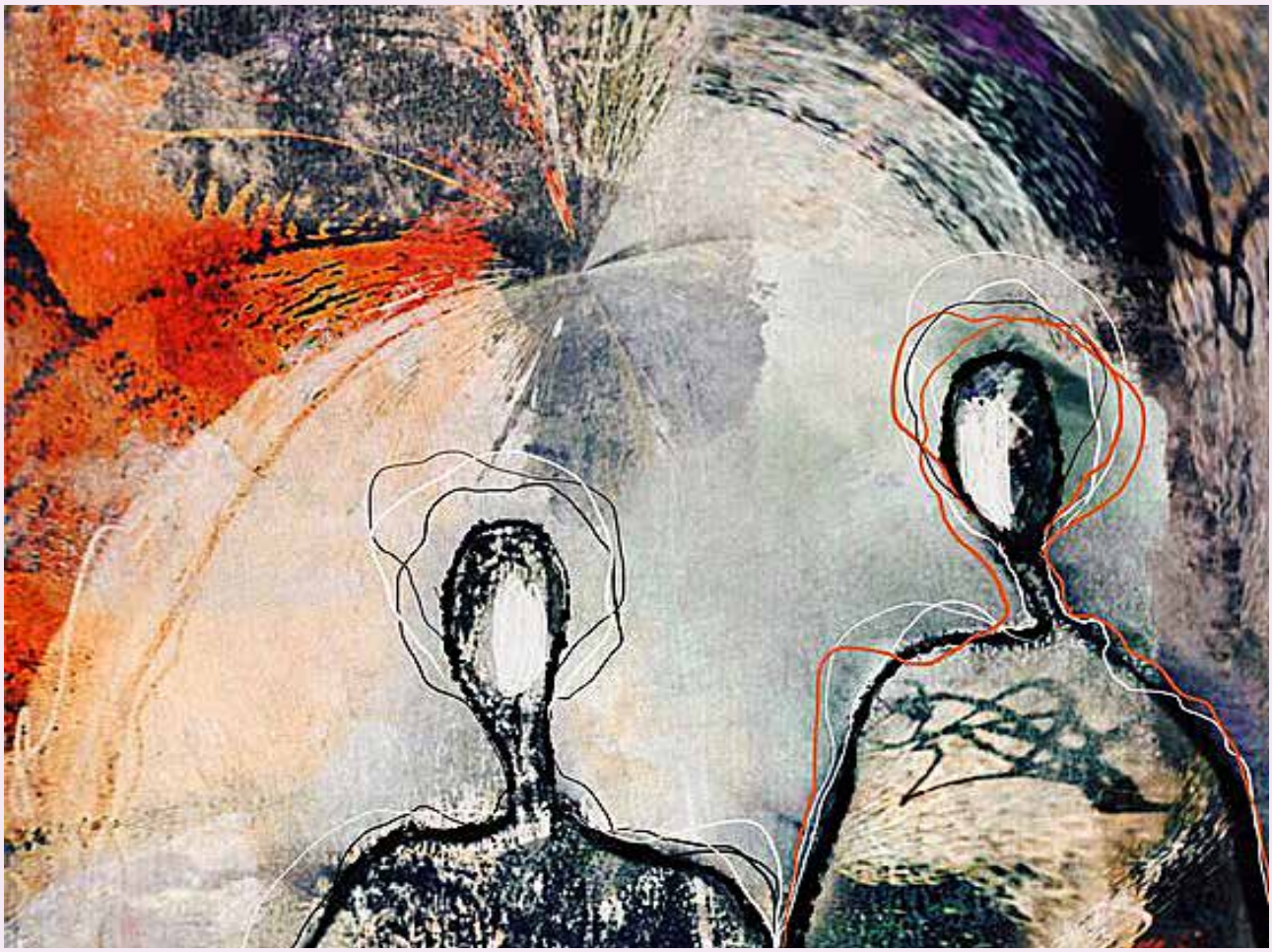

বহ্নিলতা

অমর মিত্র

ধারাবাহিক উপন্যাস

আছি। বলতে গিয়ে থেমেছিল অতনু। ভালো আছে কি সত্যি? সুগার হয়েছে। হাঁটুতে ব্যথা। বয়সের লক্ষণ যা যা সব হয়েছে তার। সে কথা চেপে অতনু জিজ্ঞেস করেছিল, 'হ্যাঁরে তোর চুল পেকেছে শুধু, কিন্তু মাথায় এখনো অত চুল, তুই কেমন আছিস, তোর কথা শুনব, জেলে ছিলি, না গ্রামে?'

বন্ধু-আবিষ্কারের পরও সুশান্ত সেই বিরলকেশ প্রবীণের সঙ্গে মেলাতে পারছিল না চল্লিশ বছর আগের অতনুকে। একই অতনু, না অন্য কেউ? মুখের কাটা দাগটি একই রকম আছে। সেই অতনুই, না হলে সে চিনল কী করে? এখন তার চোখের জ্যোতি বেড়েছে মনে হয়। সব চিনতে পারে ইদানীং। সে বলল, জেলে ছিলাম অতনু। বেরিয়েছি সেই ৮১ সালে। কী করি? কতকিছু করি? বলব সব। শুনবি?

শুনব শুনব। হাল্‌ভাঙা নাবিকের মতো দিশাহারা অতনু আঁকড়ে ধরে সুশান্তকে। সুশান্ত বলেছিল, চল আমার সঙ্গে, হাঁটুতে ব্যথা তোর, সুগার?

তোর এসব নেই? অতনু জিজ্ঞেস করেছিল

সুশান্ত মাথা নেড়ে বলেছিল, না নেই, হয়েছিল রে, তা ছ'বছর আগে, তখন লতা এলো আমাদের বাড়ি, লতা আমাদের মেয়ে, লতা আসতে ব্যথাটা নিজে নিজেই সেরে গেল, সুগার ধরা পড়েছিল, কিন্তু আপনা আপনি চলে গেল কী করে বলতে পারব না, এখন কিছুই নেই, ঘুম হয় ভালো, ব্লাড প্রেশার স্বাভাবিক, লতা ক্লাস ইলেভেন, জীবনে প্রথম সফলতা।

আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। অতনু বলেছিল, বিদেশে থাকে, সব কিছু বিস্বাদ হয়ে গেছে সুশান্ত, সন্ধেয় বাড়ি ফিরে সিরিয়াল দেখি, পুরোন খেলা দেখি, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ি।

তারা বসেছিল দ্বিতল কাফেটেরিয়ায়। নিচে ট্রেনের ভোঁ, বহু মানুষের গলার স্বর ঢেউয়ের মতো বয়ে যাচ্ছিল। উপরেও ছিল গুনগুন। কথা হয়েই যাচ্ছে। কথার কোনো শেষ নেই। লতার কথা বলল সুশান্ত অল্প করে, শুধু বলল, আয়, আমি কেমন ভাবে বেঁচে আছি দেখে যা অতনু।

টিভি সিরিয়াল দেখিস না? অতনু জিজ্ঞেস করেছিল।

না, দেখি না।

টিভির কোন্দল শুনিস না, অতনু জিজ্ঞেস করেছিল, ঘণ্টা খানেক ঝগড়াঝাটি?

সময় নেই। সুশান্ত বলে।

ক্রিকেট দেখিস না?

উঁহু, সময় কই?

সন্ধেয় বাড়ি ফিরিস সুশান্ত? জিজ্ঞেস করেছিল অতনু।

ফিরি, না ফিরে কি উপায় আছে, বাড়ি আমাকে টানে যে, কাজ না থাকলে বাড়ি, মেয়ে পড়ে, আমরা শুনি চুপ করে, মেয়ে গল্প বলে, আমরা শুনি, কী ভালো আছি আমি।

লেটে বিয়ে? জিজ্ঞেস করেছিল অতনু।

না, লতা এলো যে অনেক পরে, না এলে সুগার হতো, হাঁটুতে ব্যথা হতো, মাথার চুল পড়ে যেত, দাঁতে ব্যথা, সবই তো ছিল রে আমার বলতে পারিস, পরিবারে ছিল তো। সুশান্ত বলেছিল।

হাঁটুর ব্যথা চলে গেল ! বিস্মিত হলো অতনু, কী করে গেল?

জানি না, লতা আসার পরই গেল।

কী লতা? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে অতনু।

বহ্নিলতা, সুন্দরবনের, আমার বাড়ি আয়, বহ্নিলতা দেখবি, কবে আসবি বল, অনেক কথা আছে। বলল সুশান্ত, আয়, তোর কথা শুনব অতনু।

আমার আবার কী কথা, জীবনটা কেমন করে বয়ে গেল।

সুশান্ত বলল, আমি মেদিনীপুর , বাঁকুড়া, মালদা জেলে ছিলাম ১৯৭৬ থেকে, পাঁচ বছর, বেরিয়ে তোর খোঁজে গিয়েছিলাম, তোরা চলে গেছিস, আমি তোকে ভুলিনি অতনু, ভাবতাম তুই নিশ্চয় বড় লেখক হবি।

অতনু বলল, ১৯৭৬-এ আমি মেদিনীপুরে ছিলাম, কেরানীটোলায় অফিস।

তাই, আমিও তখন ওখানে, জেলের কুটুরিতে, জেল ভেঙে বেরিয়েই এসেছিলাম প্রায়, ধরা পড়ে যেতে বদলি করে দিলো মালদা জেলে।

১৯৭৬-এ জেল ভাঙতে চাইছে সুশান্তরা। কোন মাস? এপ্রিল। তখন জেলখানার পাশ দিয়ে রিকশা করে অফিস যাচ্ছে অতনু। আবার রাজ কাপুরের ববির দর্শক হচ্ছে মহুয়া সিনেমা হলে নাইট শোতে। ডিম্পল কাপাদিয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে মেসের বেডে শুয়ে তাকে নিয়ে গুনগুন করছে। তখন কোনো এক রাতে জেলখানার পাগলা ঘণ্টি বেজে উঠেছিল। তারা কানাঘুষো শুনেছিল। এমারজেন্সি ছিল। কৌতূহল প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল। মনে পড়ল অতনুর। গায়ে রোঁয়া কাটল। কেউ কি মারা গিয়েছিল? কবি দ্রোণাচার্য ঘোষ, তিমিরবরণ সিংহ এমন এক ঘটনা ঘটাতে গিয়ে কিংবা এমনি রাষ্ট্রের হিংসায় জেলখানার ভিতরে পুলিশের গুলিতে খুন হয়েছিল। অতনু কিছু জানে, অনেকটাই জানে না। তখন চাকরি করেছে চাকরি। অতনু বলল, শুনব, শুনব, না শুনে কি পারবরে... ।

এসো শিল্পী, এসো বিশ্বকর্মা, এসো স্রষ্টা
রসরূপ মন্ত্র দ্রষ্টা
ছিন্ন কর, ছিন্ন কর, বন্ধনের এই অন্ধকার।

আবার ভেসে এলো নবজীবনের গান। চল্লিশ বছরের শীতল অন্ধকার ভাঙতে লাগল। ঠিকানা নিল আর ফোন নং নিল অতনু। ট্রেনে দমদম নেমে গেল। দমদম থেকে রিকশা করে গা এলিয়ে উমাকান্ত সেন লেন। তাদের ফ্ল্যাটবাড়ির নাম 'আপনঘর'। বড় আবাসন। লিফট অবধি নিজেকে টেনে নিয়ে স্থির হলো। পায়ের ব্যথা খুব ভোগায়। আশ্চর্য! সুশান্ত কেমন দৌড়াতে লাগল ট্রেনের সামনের দিকে। অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল অতনু। এত বয়সেও সেই যৌবনকালের মতো ছুটতে পারে সুশান্ত। অতনু ফ্ল্যাটে ঢুকে কুন্তলাকে বলল, অদ্ভুত, কী এক লতার গুণে...

কুন্তলা বলল, সাধুর লতা?

না, বলল বহ্নিলতা, সুন্দরবনে জন্মায়। অতনু বলল। সোফায় গা এলিয়ে বসল সে। চুপ করে থাকে। আশ্চর্য, সে চিনতেই পারেনি সুশান্তকে। অথচ সুশান্ত তাকে চিনেছে। অফিস কলিগ যার সঙ্গে দশ বছর পাশাপাশি বসে কাজ করেছে, ক'দিন আগে মেট্রোয় দেখা, মুখোমুখি সিটে। তাকে শনাক্ত করতেই পারেনি। চুল ঝরে গেছে মেয়ের বিয়ের পর। সুগার বেড়েছে। ব্লাড প্রেশার। অতনু কিন্তু তার কলিগকে ঠিক চিনেছিল। অতনুর বদলানো চেহারা শনাক্ত করতে পারেনি সেই কলিগ। কুন্তলাকে সব বলতে আরম্ভ করল অতনু মুড়ি শশা খেতে খেতে। কী আশ্চর্য, টিভি বন্ধ করে দিয়ে পুত্রবধুর শাশুড়ি নির্যাতন দেখা বন্ধ করে দিলো কুন্তলা, শুনতে লাগল সুশান্ত বৃত্তান্ত, অতনু অনেকটা বলে ঘণ্টা দুই বাদে মোবাইলে ধরে সুশান্তকে, বাড়ি পৌঁছলি?

হ্যাঁ, এই তোর কথা হচ্ছে, তুই আর আমি 'সংক্রান্তি' আরম্ভ করেছিলাম তা শুনে লতা আর ওর মা বলছে তোকে দেখবে।

সংক্রান্তি! বের হয় মানে বের করছিস? অতনু অবাক। এও যেন নবজীবনের গান।

হ্যাঁ, অজ্ঞানতার বিপক্ষে সংক্রান্তি, বছরে চারটি বের হয়, লতাকে দিয়ে আমি লেখাব, ওর উচ্চ মাধ্যমিক হয়ে যাক, ও সুন্দরবনের কথা লিখবে, সুন্দরবনের মানুষের জীবন।

আমি? অতনু বলে উঠল।

তুই, কী লিখবি বল? জিজ্ঞেস করে সুশান্ত।

আচ্ছা যাই তো তোর বাড়ি, তুই কেমন ছুটলিরে, পারিস এখনো!

পারি, অসুবিধে হয় না।

হাঁপ ধরে না, বুক ধড়ফড় করে না? অতনু জিজ্ঞেস করেছিল।

সুশান্ত ওপার থেকে বলল, একদম না, অথচ বছর পনেরো আগে একবার কথা হয়েছিল পেসমেকার বসাতে হবে, ভালোই আছি।

অতনুর মনে হয় সুশান্ত বানাচ্ছে। পেসমেকার বসানোর গল্পটি সত্য নয়। অমন কেউ ছুটতে পারে বছর চব্বিশের মতো। আচ্ছা সুশান্তই তো। অন্য কেউ নয় তো? সেই সুশান্ত, ২২-২৩ এর তো নয়। এ অন্য সুশান্ত। অন্য কেউ।

ঠিক হলো পরের রবিবার যাবে সে সুশান্তর বাড়ি। সুশান্ত বলল, আয়, ভালো লাগবে তোর, আমরা পুরোন দিনের গল্প করব, ওরা শুনবে, দ্যাখ, অতীতের কোনো সীমা নেই, এই যে আমাদের বহ্নিলতা, ওর জন্ম এই সেদিন, ১৯৯৫-এ, কিন্তু ও ১৯৭৮-৭৯-র মরিচঝাঁপির কথা বলে, তার আগে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, দাঙ্গা, ১৯৬৪-তে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসার কথা, এক এক সময় মনে হয় ও চৈনিক বিপ্লব, রুশ বিপ্লবের কথা শোনাবে, মাওয়ের লং মার্চের কথা বলবে, ও যেন লং মার্চে হেঁটেছিল, যা পড়বে, যা শুনবে, সবই যেন ওর নিজের করে নেয়।

কী যে বলিস তুই সুশান্ত! অতনু উড়িয়ে দেয় অবিশ্বাস্য সব কথা। কিন্তু সুশান্ত বলে, তুই আয়, দেখে যা অতনু আমাদের বহ্নিলতাকে, গায়ে সুন্দরী আর গরান গাছের বন আর কাদামাটির গন্ধ পাবি অতনু, আয়।

সুতরাং অতনুকে যেতে হয়। যেতে হবেই। না গিয়ে উপায় নেই। বহুদিন বাদে যেন গা চনমন করতে লাগল, উৎসাহ এলো মনে। ছন্দা বলল, সেও যাবে, একা বাড়ি থেকে কী করবে, রোববারে টিভিতে যে সিনেমা, তা অন্তত বার পনেরো দেখেছে সে, দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছে স্বাভাবিক ভাবে। ড্রাইভার ডাকা হলো ফোন করে। বহুদিন বাদে গাড়িটি বেরোল গ্যারেজ থেকে। নিচে নামার আগে অতনু ফোন করল সুশান্তকে। গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে তারা। কোন পথে যাবে, বিটি রোড ধরে ডানলপ পেরিয়ে কোন জায়গা থেকে ঢুকবে, কামারহাটির মোড়?

না না না, গাড়ি নিয়ে আসিস না, আমাদের বাড়ি লম্বা একটা ঘুরপ্যাঁচের গলি দিয়ে ঢুকতে হবে, গাড়ি ঢোকে না অতনু ওপথে, অনেক

দূরে রেখে হেঁটে আসতে হবে তোকে, পায়ে ব্যথা বলছিলি না, অটো আমাদের বাড়ির সামনে আসে, ট্রেনে আয়, স্টেশনে অটো পাবি, বলবি বহ্নিলতাদের বাড়ি, শ্যামের গলি।

সাত.

সিঙ্গুরের জন্য সেই মিছিলে যায়নি বটে সুশান্ত, কিন্তু ক'মাস বাদে নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাবের জন্য জমি অধিগ্রহণ রুখে দিয়ে পথে নামল মানুষ। রক্তাক্ত হলো বসন্ত দিন। সকালবেলায় গুলি চলল, মানুষ মরল। আবার খবর এলো অনেক। সত্য মিথ্যা অনেক রকম ভয় ধরানো খবরে নগর উত্তাল হলো। মানুষের মিলিত গর্জন শোনা যাচ্ছিল। শাসকদল দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। একের পর এক মিছিলে নগর ফুটছিল। বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ বুঝি ভেসে এলো বহু যুগের ওপার হতে। এক মিছিলে একাই পা ফেলেছিল সুশান্ত। আর এক মহামিছিলে তারা তিনজন যাবে। এই সময় তাকে ফোন করেছিল অনিমেষ, সুশান্তদা, আপনি আজ না বের হলেই ভালো।

সুশান্ত অবাক, বলল, তুমি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছ অনিমেষ?

অনিমেষ বলল, আপনি একটা মেয়েকে নিয়ে এসেছেন সুন্দরবন থেকে, সুশান্তদা, মাথায় রাখবেন, এই ঘটনা সম্পূর্ণ বেআইনি।

আমি আইন জানি অনিমেষ।

সুশান্তদা আপনি এটা পারেন না, মানুষ কেনা বেচা কি আইনসিদ্ধ?

কী বলছ তুমি অনিমেষ! সুশান্ত হতবাক হয়ে ফোন হাতে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমরা খোঁজ নিয়েছি, আপনি অমুক তারিখে এক পুরোন নক্সাল কমরেডের সঙ্গে মথুরগঞ্জে গিয়েছিলেন, বিশ্বনাথ গায়েন, তার উপর পুলিশের নজর আছে, সুন্দরবন থেকে মেয়ে পাচার করা তার কাজ, অনেক করেছে, আমি ভুল বলছি কি?

সুশান্ত নিজের ভিতরে ফিরে এসেছিল, বলল, মনগড়া গল্প, লোকটাকে তুমি চেন না, ওদের কাছে ভগবান।

অনিমেষ বলল, সব রিপোর্ট আছে আমাদের কাছে, আপনারা টাকা দিয়ে এসেছেন মেয়েটার বাবাকে, কেন, দাম দিতে গিয়েছিলেন?

আমি তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলব না অনিমেষ। সুশান্ত বলল।

আপনি রাগ করবেন না সুশান্তদা, আমরা সব জেনেও কি কিছু বলেছি, বলিনি, আপনার চিন্তা নেই, পার্টি আপনার পক্ষে আছে, আপনিও পার্টির পাশে থাকুন। অনিমেষ স্বাভাবিক হয়ে বলতে চেষ্টা করেছিল।

ফোন কেটে দিয়েছিল সুশান্ত। সেই সময় মিছিলে শহর অচল হলো। ডাক এলো, মিছিলে এস সুশান্ত। আবার পথে নামো, পথেই হবে পথ চেনা।

মিছিলের খবর শুনে লতা বলল, আমিও যাব মা, মনে হয় কতদিন মিছিলে হাঁটিনি মা, সেই ঠাকমা যমুনাবুড়ি বলে মরিচঝাঁপি আসার কথা, তারপর আর মিছিল হলো কই!

বিস্ময়ে মেয়েকে দ্যাখে সুশান্ত। এইটুকু মেয়ে, এগারো থেকে বারো, বলছে এমন কথা, যেন তাদের সঙ্গে মিছিলে হেঁটেই সে এ বাড়িতে এসেছে। মিছিল চেনে সে। মিছিল কি দ্যাখেনি তার দিদিমা? তারা থাকে আর এক দ্বীপ ছোট মোল্লাখালি। কোলে মা পুষ্পরানি তখন দু-বছর। খুলনা জেলার বড় গঞ্জ চুকনগর থেকে সাতক্ষীরে হেঁটেছিল সবাই ভদ্রা নদী পার হয়ে এসে। সেই মিছিল রাজপথে ছিল না। গাঁয়ের ভিতর দিয়ে, মাঠ পেরিয়ে, বন-বাদাড় পেরিয়ে, খাল পার হয়ে মিছিল হেঁটেই চলেছিল সাতক্ষীরের দিকে। ভোমরা বর্ডার বেশি দূর না সেখান থেকে। বর্ডার পার হয়ে বসিরহাট। খানসেনারা রওনা দিয়েছে যশোর সেনানিবাস থেকে, তারা চুকনগরের দিকেই আসছে। পথে দেশত্যাগী আতঙ্কিত মানুষের মিছিল দেখলে খানসেনারা কি ছেড়ে দিত? এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে মেরেই দিত সকলকে। কত খুন করেছিল মা খানসেনারা। মেয়েদের সম্মান নষ্ট করেছিল কত। রাজাকার, খান সেনা-সকলের রোষ যেন মেয়েমানুষের উপরই বেশি। অত্যাচার করে বুলি আর নৌরিনরে মেরেই ফেলল। আহা, মনে পড়লি চোখে জল আসে এখনো। আমরা দিনে লুকিয়ে থাকতাম বনে বাদাড়ে, শুকনো চিড়ে আর গুড় পেটে দিয়ে দিনমানে বিশ্রাম সব চুপ। রাতে জোছনায় হাঁটা।

তুই কি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছিসরে লতা? বহ্নিশিখা অবাক।

হ্যাঁ মা, মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছি, এপারে এসে কেউ কেউ তো ফেরেনি, দিদমারা ফেরেনি ছোট মোল্লাখালি থেকে, ওখেনে দিদমার ভাইরা থাকত, দিদমা আসলে এপারের মেয়ে ছিল, বিয়ের পর ওপারে গিয়েছিল। লতা গুছিয়ে সব বলে।

তুই এত জানিস, জানলি কী করে? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করে।

জানি মা, মনে পড়ে যায়, পথে কত ভয়, রাজাকারের দল যদি দেখতি পায়, আমিও ছিলাম যেন সেই মিছিলে,আমার মা-ও ছিল... মনে পড়ে সব, চলো মা মিছিলে যাই। লতা বলেছিল বহ্নিকে জড়িয়ে ধরে, আমি একটু মিছিলে হাঁটব, কতদিন এমনি মিছিলে হাঁটিনি।

মেয়ের হাত ধরে তারা বেরিয়ে পড়েছিল। কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল শুরু হয়ে যাবে ধর্মতলা। সিঙ্গুরের তিনফসলী জমিহারা চাষিদের পক্ষে মিছিল বেরিয়েছে। কে এসেছে সঙ্গে, ও সুশান্ত?

আমাদের মেয়ে, বহ্নিলতা। বলতে বলতে, জবাব দিতে দিতে সুশান্তর বুক প্রসারিত হয়ে যায়।

বাহ, বহ্নিশিখার মেয়ে বহ্নিলতা, অগ্নিলতা, এইটুকু মেয়ে হাঁটছে ! পুরোন কমরেড পা টেনে টেনে হাঁটতে হাঁটতে বলল।

এস মুক্ত করো মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার। হাঁটছে মেয়ে, মুখখানি হাসিতে ভরা। একটুও কষ্ট নেই এই প্রখর রৌদ্রে। যেন চাঁদের আলোয় হাঁটছে। মেঘের ছায়ায় হাঁটছে।

সেদিনের দু'দিন পর থানা থেকে পুলিশ এসেছিল। একজন সাব-ইনসপেক্টার দরজায়। তখন রাত দশটা হয়ে গেছে। দরজা খুলেছিল সুশান্তই। পুলিস সময় বুঝেই এসেছিল। অনেক রাতে দরজায় পুলিশের কড়া নাড়া মানে ভয় দেখাতে আসা তা জানে বহ্নি আর সুশান্ত। পুলিশি অভিজ্ঞতা তাদের বিস্তর। মনে পড়ে গিয়েছিল এক কাস্টমস অফিসার সুরজিত দত্তর কথা। তার ফ্ল্যাটে মধ্যরাতে হানা দিয়েছিল পুলিশ। নিরীহ মানুষটির সঙ্গে নাকি মাওবাদিদের যোগাযোগ আছে। থানায় নিয়ে গিয়ে সমস্ত রাত জেরা। তারপর ক্রমাগত পুলিশি হানা। কোন মাওবাদি নেতার ডায়েরিতে নাকি তার ফোন নং পাওয়া গেছে। লোকটা চাপ সহ্য করতে পারেনি। রেললাইনে গলা দিয়েছিল। মামলা চলছে। বহ্নি আর সুশান্ত বুঝে নিতে থাকে, স্নেহ আর মায়ার পৃথিবী, ভালোবাসার পৃথিবী শেষ করে দিতে কেউই পিছ-পা নয়। রাষ্ট্রশক্তির কাজই তাই। রাষ্ট্রশক্তি জানে স্নেহ, মায়া, ভালোবাসা মানুষকে জোটবদ্ধ করে। তা ভাঙতেই রাষ্ট্র তার দাঁত নখ বের করে আনে। এখানে পার্টি মনে করছে তার স্বার্থ রাষ্ট্রের স্বার্থ, যেহেতু সরকার সে-ই চালায়, মানুষের জীবন-যাপন, স্বপ্ন সবই তার নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা। তুমি মিছিলে গেছ। মেয়েটাকে নিয়ে গেছ। আমরা তা পছন্দ করছি না। সুতরাং মধ্যরাতেও পুলিশ পাঠাতে পারি তোমার দরজায়। ভয়ে থাকো তুমি। ভয় থাকলে ভালোবাসতে পারবে না, জোট বাঁধতে পারবে না।

মেয়েটাকে কোথা থেকে এনেছেন মিঃ রায়? সাব-ইনস্পেক্টার জিজ্ঞেস করল। আপনাকে বলতে হবে? সুশান্ত ফুঁসে উঠেছিল।

নিশ্চয়, ও কি আপনার আত্মীয়? জিজ্ঞেস করেছিল এস,আই।

না, আত্মীয় নয়, আবার আত্মীয়ও নিশ্চয়। জবাব দিয়েছিল বহ্নিশিখা, নিজের করে নিয়েছি।

হেঁয়ালি করবেন না, যা জিজ্ঞেস করছি জবাব দিন, আপনারা নক্সাল করতেন, এখন কী করেন সে খবরও আমাদের কাছে আছে, বলুন মেয়েটিকে কেন এনেছেন সুন্দরবন থেকে?

লালন পালন করতে। সুশান্ত জবাব দিয়েছিল।

দেখুন মিঃ রায় আপনি কেন এনেছেন তা পরিষ্কার করে আমাদের সব বলতে হবে, ডিক্লেয়ারেশন দিতে হবে, মেয়েটার ছবি সমেত সমস্ত ডিটেইল দিতে হবে থানায়, থানা তদন্ত করে দেখবে, আপনার বয়ান সত্য কি না।

তারপর? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করেছিল।

সুন্দরবন অঞ্চল থেকে প্রচুর মেয়ে পাচার হয়ে যায় সারা বছর এইভাবেই, আপনাদের তেমন কোনো উদ্দেশ্য আছে কিনা বুঝে নিতে হবে। •

চলবে...

ছোটগল্প

বাড়ি

মণীশ রায়

খুব তো বেশিদিন আগের কথা নয় এসব। ভুলব কি করে? নিজের অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশে থাকা একখানা বাড়ি। কেউ কি ভোলে কখনো? যখনকার কথা বলছি তখন, সত্যি বলছি, চারপাশে ভয়-ডর বলতে তেমন কিছু ছিল না। হাতেগোনা গ্রামের দু-চারজন পরিচিত সিঁধেল চোর-ডাকাত আর রহস্যপূর্ণ জংলি অন্ধকারে বেড়ে ওঠা কিছু অদৃশ্য ভূত-প্রেতের অশরীরী গাল-গপ্পো! এর বাইরে মানুষের জীবন একেবারে পান্তার মতো সহজপাচ্য। সীমিত চাওয়ার মতো পাওয়াটুকুও নিতান্ত ডালভাত।

দোচালা টিনের ঘরের দখিন দুয়ার খোলা রেখে তখন আমরা ঘুমোতাম। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে ঝোপ-ঝাড় আর বৃক্ষময় অন্ধকার উঠোন থেকে লেবুফুলের গন্ধ ভেসে আসত নাকে। বৃষ্টি বা বাদলা হলে মাটির সোঁদা গন্ধ। আনন্দে মাটির অন্তর চিরে কেঁচোগুলো পর্যন্ত উঠে এসে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াত আমাদের বাড়ির বৃষ্টিভেজা স্যাঁতস্যাঁতে আঙিনাজুড়ে।

আমাদের চোখ-সওয়া সে-দৃশ্য

উঠোনের পেয়ারা আর কদমগাছ দুটোকে মনে হতো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুই সহোদর। বছর পুরনো আম-কাঁঠাল গাছগুলোকে ভাবতাম বর্ম পরা যুদ্ধ-ময়দানের সৈনিক। মাথা উঁচিয়ে কল্পনায় শান দিতাম বারবার

বৃষ্টির নির্মল ফোঁটার মতোই নরম এক অস্তিত্ব বলে মনে হতো সবাইকে।

উঠোন পেরোলে মেঠো রাস্তা। রাস্তার পাশে পলিত কেশের মাথার মতো থোক থোক ফুলে ছাওয়া তীব্র সুগন্ধ ছড়ানো এক-একটি কামিনি ফুলের গাছ। ঝরা ফুলগুলো উপুড় হয়ে গড়াগড়ি খেত রাস্তার ওপর। বৃষ্টিসিক্ত গেরুয়া মাটি আর শুভ্র কামিনি মিলেমিশে একাকার। আমরা আমাদের শরীরে সেই গন্ধ মেখে এবং পায়ের তলায় ফুল ও কেঁচো মাড়িয়ে চলাফেরা করতাম খালি পায়ে।

উঠোনের পেয়ারা আর কদমগাছ দুটোকে মনে হতো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুই সহোদর। বছর পুরনো আম-কাঁঠাল গাছগুলোকে ভাবতাম বর্ম পরা যুদ্ধ-ময়দানের সৈনিক। মাথা উঁচিয়ে কল্পনায় শান দিতাম বারবার। সঙ্গে চেনা-অজানা অজস্র ঝোপঝাড়ের আনুগত্য। ওরা সবাই মিলে পুরো উঠোনটা শ্যামল ছায়ায় বেঁধে রাখত। একা বেরোলে গা ছমছম করত আনন্দ ও শিহরনে!

আসলে আমাদের বাড়িটা ঘিরে ছিল শুধুই গাছ আর বনবাদাড়। সীমানা বেড়া কিংবা দেয়াল বলে কিছু নেই। শুধুই নির্ঝঞ্ঝাট একখানা বাড়ি। নানারঙের পাখি, বেজি, তক্ষক, কোলা ব্যাঙ আর ঝিঁঝিরাও অন্য অনেকের মতো এর পাহারাদার।

বাড়ির ঠিক কাছ দিয়ে চলে গেছে রেললাইন। একটু পরপর ট্রেন চলে যায় আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে আর হুক্কা-হুয়া হুইসল বাজিয়ে। আমরা ট্রেনের গতিবিধি আর শব্দ শুনে দূর থেকে বুঝে নিতাম সময় এখন কতো।

বর্ষা এলে ডুবোচরের মতো ঘোলা জলের একটা খাল জেগে উঠত আমাদের বাড়ির ঠিক পিছনে। বর্ষায় খালটা ফুঁসে উঠত, শীতে গরু-ছাগল চড়া ঘাস-পাতার ম্যাদম্যাদা এক মড়া জমি। আমরা খালপাড়ের কোনো একটা উঁচু গাছের মগডালে বাঁদরের মতো উঠে গিয়ে ঝাঁপ দিতাম সেই জলে। মাছ ধরতাম, ধুতুরার বেগুনি-সাদা ফুল কানের খাজে গুঁজে রাখতাম, গলায় কদমডাল জড়িয়ে নেচে বেড়াতাম। নেশা না করেও বর্ষার অদ্ভুত এক নেশা চড়ে যেত মাথার ভেতরে। সেই ঘোরে সারাদিন বিবশ হয়ে মেতে থাকতাম। ঘুরে বেড়াতাম এদিক-ওদিক।

যখন খাড়া পহাড়ি জলের ঢল বন্যায় রূপ নিত তখনো, সবার দুর্দশা সত্ত্বেও, আমি মাছ ধরা নিয়ে মেতে থাকতাম। সঙ্গে রুবিকে পেতাম। ফরেস্ট অফিসারের রূপসী কন্যা। বাংলো থেকে বেরিয়ে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে এসে দাঁড়াত আমার সামনে। 'এই ছেলে, মাছ ধরা শিখাবি?' কদিনেই শিখে গেল। 'গাছে ওঠা শিখাবি?' তরতর করে গাছে ওঠাও রপ্ত করে নিল। আমার চেয়ে দুবছরের বড় হয়েও আমার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেল যে আমি ওকে ছেলে ছাড়া কিছু ভাবতেই পারতাম না। সবাই মিলে এই যে আমরা অর্থাৎ আব্বা, আম্মা, দাদি আর ছোটো-ছোটো তিন ভাই-বোন–সবাই ওকে মেয়ে নয়, আমারই মতো ছেলে ভাবত। চেষ্টা করেও মেয়ে হিসেবে কেউ ওকে মেনে নিতে পারত না।

রুবির চলাফেরাটা এমন ছিলো যে মনে হতো সে একটা দুরন্ত ছেলে। ছোট করে চুল ছাঁটা, জিন্সের প্যান্ট, টি-শার্ট, কথাবার্তা, চিন্তাভাবনা–সব ওকে ছেলে করে তুলেছিল আমাদের পাহাড় আর টিলা ঘেঁষা গ্রামের মানুষদের কাছেও।

ছমাসের মতো আমাদের পরিচয়। তারপর ওর আব্বা বদলি হয়ে গেলেন অন্য জায়গায়। রুবি বলল, 'আমি আসব একদিন। দেখিস।'

বছর চারেকের মাথায় কয়েক ঘণ্টার জন্য রুবি ঠিক ফিরে এলো আমাদের গ্রামে। ওর আব্বার প্রমোশন হয়েছে। মেয়ের বুয়েটে পড়ার সুযোগ মিলেছে। লাল টি-শার্ট আর নীল জিন্স রুবির পরনে। কোনো মেক-আপ নেই মুখে, ঠোঁটজোড়া লিপস্টিকহীন। তবু ওর চলে যাওয়ার পর আম্মা বললেন, 'কুনকিছু না মাইখ্যাও কি সুন্দর মাইয়াডা!'

মুখে পান দিয়ে জিহ্বার ডগায় চুন ঘষার মতো আব্বা মন্তব্য করলেন, 'বুনো ফুল। বুনো ফুলের আবার সাজগোজ কি?' বলে রাখি, আব্বা তখন ঢাকায় থাকেন। পেশায় সাংবাদিক এবং কিঞ্চিৎ কবিতানিষ্ঠ মানুষ। সবকিছুতেই অন্যরকম একটা অর্থ খুঁজে পেতেন।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে রুবি বলল, 'তুই তো হিউম্যানিটিজ। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কোনোটাই হইতে পারবি না। এক কাজ করো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ঢাকায় চলে আয়। একটা জিনিস শিখিয়ে দেবো।'

'কেন? কি জিনিস?' আমতা আমতা করতে শুরু করি। বুঝতে পারি না কিছু।

'আরে, অত নার্ভাস হবার কি আছে? তোর কাছে কতকিছু শিখেছি না? প্রতিদান, ব্যস। তবে সব কেনর উত্তর হয় না হাঁদারাম!' বলে রুবি আমার চুল ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলো। ওর চোখে, স্পষ্ট মনে হলো, জলের তলায় ডানকিনি মাছের ভেসে বেড়ানোর মতো একচিমটি রহস্য।

সত্যি বলছি, সেসময় থেকে যে একটা চিন্তা ঢুকল আমার মাথার ভেতর, তা থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি মিলছে না আমার। রুবি আসলে কি শেখাতে চাইছে আমায়? সে তো আমার কাছে পুরুষ বৈ অন্য কিছু নয়। আম-জাম-তেঁতুলের মতো আমার কাছে ওর অস্তিত্ব। তবু সে কী শেখাতে চায় আমায়? যৌনতা নয়তো?

বুয়েটে রুবির দুবছর থাকতে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে চলে এলাম। রুবি দেখেই বলল, 'বাংলা-ইংরেজি পড়তে ঢাকায় চলে এলি?' বলে হেসে উঠল।

'তুই না আমায় কি শিখাবি বলেছিলি?'

'বাব্বা, ভুলিসনি দেখি? ওকে। শিখাব। প্রমিজ।'

দুবছর ধরে ওর সঙ্গে দেখা হলে প্রথমেই আমি একথা জিজ্ঞাসা করি। রুবির এককথা, 'এই বাংলা, প্রতিদান পেতে চাস? তাই তো? পাবি, পাবি।'

আমি মাথা নাড়ি আর হাসি। সে আমার এ হাসিটা লক্ষ করে। ওর উচ্চতা আমার চাইতে বেশি। নির্মেদ শরীর। কুংফু-ক্যারাতে শেখে এবং নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বুয়েটের এক পরিচিত মুখ সে। পুরুষালি চাল-চলন। কেউ ওকে সহজে ঘাঁটায় না।

সে আমার পিঠে ধুমধুম করে হালকা ঘুষি দিয়ে বলে, 'শালা তুমি বাংলা হলেও বহুত হারামি। হাহাহা।' হাসিটাও আমার কানে বাজে পুরুষের মতো। নারীদের গেঁয়ো লজ্জা-শরমের ব্যাপারটাই ওর ধাতে নেই।

তবু মনের কথা মনেই থাকে, মোছে না কোনো দিন। রুবি এমেরিকায় গিয়ে এমএস করল। ডক্টরেট করে আচমকা এক ফরাসি অধ্যাপককে বিয়েও করে বসল। ওর মা আমাদের বাসায় এসে মন খারাপ করে বললেন, 'ভেবেছিলাম একমাত্র মেয়েটাকে নিজ হাতে ধুমধাম করে বিয়া দিমু। আত্মীয়-স্বজন মিলে হৈ-হুল্লোড় করুম। কপালে নেই গো আপা। কপালে নেই!' বলে রুমাল দিয়ে চোখের কোন মোছেন।

তারপর থেকে বলতে পারেন রুবির কথা ভুলেই গেছি। বিসিএস হয়নি। শুধু বাংলায় পড়াশুনো করে চাকরি পাওয়াও মুশকিল। প্রাইভেট স্কুল-কলেজে মাস্টারির চাকরি মিলবে হয়তো। তবে তা করব না ভেবে এলএললবি পাস করে উকিল হয়ে গেলাম। সেখানেও সমস্যা, ক্লায়েন্ট

নেই হাতে। বড় বড় কোম্পানিগুলোও অভিজ্ঞতা ছাড়া তাদের প্যানেল-লয়ার হিসেবে নিয়োগ দিতে চায় না।

এরকম এক জীবনযুদ্ধের ক্রান্তিকালে দেখা হয়ে গেল ফের রুবির সঙ্গে। ধানমন্ডির আলিয়ঁস ফ্রঁসেস দ্য ঢাকার এক অনুষ্ঠানে রুবি আর ওর স্বামী আমন্ত্রিত অতিথি। খুবই নামিদামি ব্যক্তিত্ব ওর স্বামী। আমি সেখানে স্রেফ একজন দর্শক। কৌতূহলবশে গেছি সেখানে।

সহসা রুবি এগিয়ে এলো আমার দিকে, 'তুই বাংলার শাহিন না রে?' মুখভরা হাসি; একটুও জড়তা নেই কথায়।

'তুই ফোর-টুয়েন্টি রুবি না?' বলে হেসে উঠলাম। আমিও যে কম স্মার্ট নই, প্রমাণ করতে চাইলাম ওর সামনে।

'আমি ফোর টুয়েন্টি? সাহস তো তোর কম নয় পোলা?' চোখ পাকায় সে। অভিব্যক্তিগুলো ঠিক আগের মতোই।

'নয়তো কি? আমায় কী যেন শিখাবি বলে দুম করে এমেরিকা চলে গেলি। বিয়েও করে ফেললি। আর এদিকে আমার ঘুম হয় না রাতভর। কী শিখাবি ভেবে ভেবে অস্থির আমি। বিয়ের আগেই দ্যাখ কেমন বুড়ো হয়ে গেছি। প্রেম-ফ্রেম কিছুই জুটল না কপালে।' বলে কাতরভাবে ওর দিকে তাকালাম।

সঙ্গে সঙ্গে বাঁধভাঙা হাসির জোয়ার রুবির। এ হাসিটা আমি চিনি। শৈশবে মাছ ধরতে পারলে, ঝটপট গাছে চড়তে পারলে ওর এমনি হাসি পেত। তখন মনে হতো পুরো বন আর দূরের ছোট ছোট টিলাগুলো ওর সঙ্গেই বুঝি যোগ দিয়েছে হাসির প্রতিযোগিতায়।

'হেসে উড়িয়ে দিবি নাকি? না শিখাস, অন্তত বলতে তো পারতি কী শিখাতে চেয়েছিলি?'

'জানি না। তুই দেখছি এখনো একটা নরম টাইপের পুতুপুতু পুরুষই রয়ে গেলি? হাহাহা।' সেই হাসিটা, আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

এসময় রুবির ফরাসি অধ্যাপক স্বামী ড. লুসিয়েন ওদের ছ-সাত বছরের সন্তানকে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। রুবি ফরাসি ভাষায় কী যেন বলল ওদের। ওরা চোখেমুখে একরাশ কৌতূহলী হাসি ছড়িয়ে আমাকে একঝলক দেখে নিল। তারপর অন্যদিকে কেটে পড়ল। হয়তো আমার মতো রঙচটা পুরনো বইয়ের পাতার প্রতি ওদের কোনো আকর্ষণ নেই, হয়তো সেজন্য।

এবার আমি একা, রুবিও একা। রুবির চোখে একরাশ উচ্ছ্বাস। মাছ ধরে আবার সেগুলো বানের জলে ভাসিয়ে দিয়ে যেরকম করে আনন্দে খলবল করে উঠত, সেরকম। আমি তাকিয়ে দেখি রুবিকে। দখিন-দুয়ার খোলা হারিয়ে ফেলা সেই বাড়িটা আমি আবার দেখতে পাচ্ছি। সেই জুঁই-কামিনি-লেবুর গন্ধ সুড়সুড়ি দিচ্ছে নাকে। মাথার ওপর বর্ষার মাতম। কেঁচোদের মানচিত্র। সব একনাগাড়ে আমার চোখে ভাসে। বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে কবে। এখন আমরা ভাইবোনেরা ঢাকায় এক-একটি ফ্ল্যাট নিয়ে দেয়াশলাইর বাক্সে বন্দি পিঁপড়ের জীবন যাপন করি সারাক্ষণ। তবু বাড়িটা কোলাজ হয়ে বেঁচে রয়েছে মাথার ভেতর।

আমি গায়ে পড়ে ফের ওকে প্রশ্ন করি, 'তুই কি সত্যি সত্যি আমায় কিছু শেখাতে চেয়েছিলি?'

রুবির ঠোঁটের কোনে রহস্যময় অস্ফুট এক হাসির ছটা। দৃষ্টিতে ক্লান্তি। ফিনফিন করে আমায় বলে ওঠে, 'স্বামী সন্তান চাকরি আর সংসার সামলে আমি নিজের নামটাও এখন ভুলে যাই, শাহীন। রোম্যান্টিকতার ছিঁটেফোঁটাও নেই আমার ভেতর। তবু মাঝে মাঝে তোর সঙ্গে ছেলেবেলার মতো মাছ ধরতে, গাছে চড়তে, বুনো ফুলের গন্ধ শুকতে খুব ইচ্ছে করে রে। এর কোনো প্রতিদান হয় না। বিশ্বাস কর শাহীন।' বলে রুবি হাসতে চেষ্টা করে। কিন্তু হাসিটা মাঝপথে কেমন যেন ভেঙেচুরে যায়। চিরচেনা সেই পুরুষালি আবেশটুকু আর থাকে না সেই হাসিতে।

এসময় আমি ওর মেকাপহীন পোড়খাওয়া শ্রান্ত চেহারার পরতে পরতে কেন যেন আমার শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিগন্ধময় অপহৃত সেই বাড়িটা খুঁজে ফিরি।

বাড়িটা কি আর ফিরে আসবে কোনোদিন? সেই বর্ষা, কুসুমিত সেই মৌতাত, সেই সোনাঝরা দামাল শৈশব-কৈশোর, ফিরে আসবে কি?

আমার চোখের কোণ আর্দ্র হয়ে ওঠে! •

মণীশ রায়
কথাসাহিত্যিক

ঘটনাপঞ্জি ❖ নভেম্বর

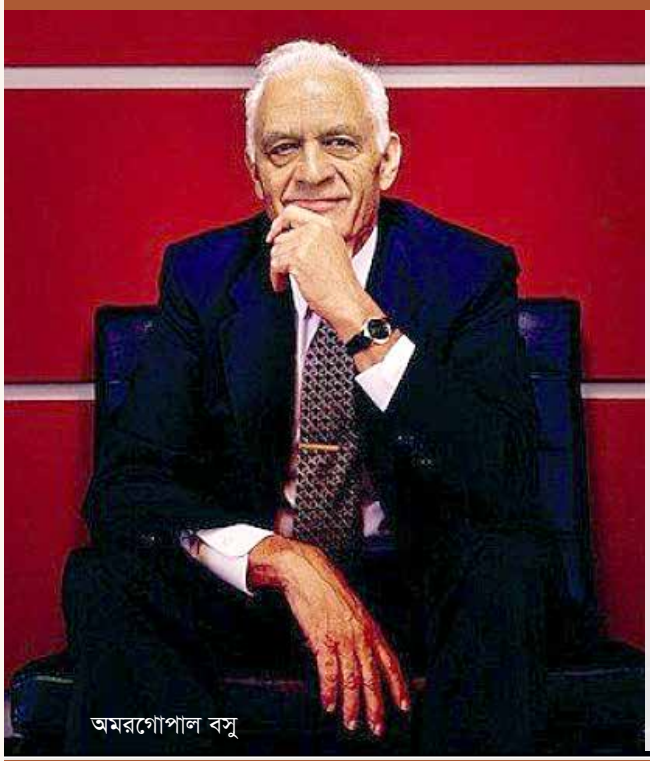

অমরগোপাল বসু

০২ নভেম্বর ১৯৩৫ ❖ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
০২ নভেম্বর ১৯২৯ ❖ শব্দ প্রকৌশলী অমরগোপাল বসুর জন্ম
০৩ নভেম্বর ১৯৩৩ ❖ নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের জন্ম
০৪ নভেম্বর ১৯২৫ ❖ চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জন্ম
০৫ নভেম্বর ১৮৭০ ❖ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জন্ম
১০ নভেম্বর ১৮৪৮ ❖ 'রাষ্ট্রগুরু' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
১০ নভেম্বর ১৯৫৪ ❖ কবি জয় গোস্বামীর জন্ম
১১ নভেম্বর ১৮৮৮ ❖ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্ম
১১ নভেম্বর ১৯০৮ ❖ গজেন্দ্রকুমার মিত্রর জন্ম
১২ নভেম্বর ১৮৯৬ ❖ পক্ষীবিদ সেলিম আলীর জন্ম
১৪ নভেম্বর ১৮৮৯ ❖ জওহরলাল নেহরুর জন্ম
১৯ নভেম্বর ১৮৩৮ ❖ কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম
১৯ নভেম্বর ১৯১৭ ❖ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম
২০ নভেম্বর ১৭৫০ ❖ টিপু সুলতানের জন্ম
২৩ নভেম্বর ১৮৯৭ ❖ নীরদচন্দ্র চৌধুরীর জন্ম
২৫ নভেম্বর ১৯৩৪ ❖ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৬ নভেম্বর ১৮৯৭ ❖ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৭ নভেম্বর ১৮৭৮ ❖ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্ম
৩০ নভেম্বর ১৮৫৮ ❖ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম
৩০ নভেম্বর ১৯০৮ ❖ বুদ্ধদেব বসুর জন্ম

লিঙ্গরাজ মন্দির

ভুবনেশ্বরে আনন্দময় দিন

প্রণব মজুমদার

ভ্রমণ

সড়ক শৃঙ্খলার একটি আলোকচিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চোখে পড়ল। ছবিটি পূর্ব ভারতের একটি শহরের। রৌদ্রময় ভরদুপুরের দৃশ্য। রাস্তা বিভাজনের সাদা দাগের বাইরে স্কুটি চালক ভদ্রমহিলাটিও নন। অপর দিকের ডান পাশের পরিচ্ছন্ন পথ যানবাহনশূন্য। ট্র্যাফিক সিগন্যালের জন্য হয়তো পরিবহণগুলো ওপাড়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু বা পাশের সবাই অনড়। সবাই সড়ক আইন পালনে দায়িত্ব ও শ্রদ্ধাশীল।

বেইলী রোডের স্বনামখ্যাত একটি প্রতিষ্ঠানে টানা এক যুগ শিক্ষা নিয়েছে কন্যা। ওর উচ্চতর শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ চিন্তিত! ভর্তি কোচিং, অপেক্ষাকৃত শিক্ষার উচ্চমূল্য ও বৈরী পরিবেশ সব মিলিয়ে অনেক অভিভাবকের মতো আমিও উদ্বিগ্ন। কষ্টার্জিত রোজগার! সীমিত আয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণির পিতা হিসেবে স্নাতক স্তরে ভর্তিতে মেয়েকে নানা জায়গায় চেষ্টা করছি। পঞ্চম, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির সকল পর্যায়ে বেশ ভালো ফলাফলের পরও মেয়ের পছন্দের বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হলো না দেশে। অবশেষে ৬০ শতাংশ শিক্ষাবৃত্তির আওতায় ভর্তির সুযোগ মিলল

মুক্তেশ্বর মন্দির

রাজরানি মন্দির

কম খরচে প্রতিবেশী দেশ ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশের ভুবনেশ্বরে বেসরকারি শিক্ষালয় কেআইআইটিতে সুযোগ হলো। ৪ বছর মেয়াদী ৮ সেমিস্টারে স্নাতক পর্যায়ে কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়বে মেয়ে। ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন এবং মেয়েকে ছাত্রীনিবাসে রেখে আসার জন্য ভারতের ভুবনেশ্বর গিয়েছিলাম ২ মাস আগে। সপরিবারে। কলকাতা হয়ে যাত্রা। ঢাকা থেকে ভুবনেশ্বরে দশদিনের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বিচিত্র।

মধ্যরাতের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস। মহানগরের আরামবাগ থেকে ৪ সদস্যের যাত্রা। সৌহার্দ্য শ্রেণির ঢাকা-কলকাতা জনপ্রতি ভাড়া ২৩০০ টাকা। প্রায় দ্বিগুণ ভাড়া কেন? পরিবহণ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য–দুসীমান্তে যাত্রীকে বাসের নিজ আসনে বসে থাকলেই চলবে। মালপত্র এবং পাসপোর্টে ভিসায় প্রবেশ সিল ইত্যাদি তদারকির কাজ গাড়ির লোকজনই করে দেবে। ভারত-বাংলাদেশ সৌহার্দ যাত্রা। রাত সাড়ে ১২টায় ভ্রমণ শুরু। পদ্মা সেতু হয়ে মাদারীপুরের একটি রেস্টুরেন্টে গিয়ে যাত্রা বিরতি। ভোর ৫টায় পৌঁছে গেলাম যশোর বেনাপোল সীমান্তে। বাস থেমে আছে। গাড়ির সুপারভাইজার এসে বললেন, ৭টায় কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন। এক লাইনে আমাদের সৌহার্দ্য বাসযাত্রীদের লাইনে দাঁড়াতে হবে! যাত্রীপ্রতি বন্দর চার্জ ১৫০ টাকা দিতে হবে। হাজার হাজার যাত্রী অপেক্ষমান। গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে তারা! সাড়ে ৬টায় খুলল বাংলাদেশ সীমান্তের অফিস। সীমান্তে এক রঙের পোশাকে দেখি ২২ জন কুলি ঘুরছে। বাস থেকে ৪টি ভারী ব্রিফকেস নামালাম। ভারত পেট্রাপোল সীমান্ত অবধি মালপত্র নিয়ে যাওয়ার শর্তে এক কুলি মজুরি হাঁকলেন ৮ শ' টাকা। শেষে ৩ শ' টাকায় রফা হলো। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বন্দর চার্জ বাবদ চারটিতেই পেলাম ৫১.৮৯ টাকার রশিদ। সুপারভাইজারকে বললাম 'প্রায় একশ' টাকা করে বেশি কেন?' উত্তর–'এটাই দিতে হয়।' ভারত সীমান্তে ঢোকার আগে মালপত্র মেশিনে স্কেনিং এবং দেহ তল্লাশি শেষে ওপাড়ে বাসে গিয়ে বসি। হরিদাসপুর থেকে বাস ছাড়ল সকাল সোয়া ৮টায়। নিয়ম মেনে চালক পরিচ্ছন্ন রাস্তায় আমাদের নিয়ে চলছেন কলকাতা মূল শহরে। আধঘণ্টা পর বারাসাত বামনগাছির সাধারণ একটি রেস্টুরেন্টে বাস যাত্রা বিরতি। হাত মুখ ধুয়ে সকালের খাবারের জন্য প্লাস্টিকের তৈরি চেয়ার ও টেবিলে বসে পড়লাম সবাই। পশ্চিম বাংলার এ হোটেলের দাদারা আমাদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলছেন। এখানে শুধু রুটি ও ভাজি নেই! থালি। ভাত, সবজি, পনির, রুটি, ডাল, টক, ধনেপাতাসহ পেঁয়াজ ও টম্যাটো একত্রে খাবার। থালির মূল্য ১২০ রুপি! একটি মাটির ঘটের দুধ চায়ের দাম ২০ রুপি! ভড়কে গেলাম! অগত্যা খেতেই হলো।

কলকাতার আকাশে ঝকঝকে রোদ। কোথাও কোনো যানজট নেই। গাড়ি চলছে। দু-একটি জায়গায় ট্রাফিক চোখে পড়ল মাত্র। শৃঙ্খলিত ও নিয়ন্ত্রিত ট্রাফিক ব্যবস্থা। কলকাতার মারকিউজ স্ট্রিটে যখন গাড়ি পৌঁছল তখন দুপুর পৌনে ১টা। সরু রাস্তার কারণে গাড়ি বেশিক্ষণ রাস্তায় দাঁড়াতে পারল না। আমাদের গন্তব্য টালিগঞ্জ মিস্ত্রি পাড়া। অ্যাম্বাসেডর হলুদ ট্যাক্সি চালক ৪ শ' রুপি চাইলেন। তাড়াহুড়োর মধ্যে বয়স্ক চালক ভদ্রলোককে বললাম ৩ শ' রুপি। রাজি হলেন। মালপত্র নিয়ে ট্যাক্সিতে চাপাচাপি। ২২ মিনিটে পৌঁছে গেলাম টালিগঞ্জে গিন্নির ছোট মামার বাড়ি। গিন্নির বড় মামা ও ছোট মাসি থাকেন হুগলীর শ্রীরামপুরে। সেখানে দুদিন বেড়িয়ে ফিরেছি টালিগঞ্জে। উবার চালক ৮০০ রুপির ভাড়া ১১০০ রুপি আদায় করে ছাড়লেন। যাতায়াতে আমাদের বেশিরভাগ বাহন উবার, ওলা এবং ট্যাক্সি। উবার ও ওলাতে যাতায়াতে নির্ধারিত ভাড়ার চেয়েও বেশি ভাড়া আদায় করে চালকরা, বিদেশি করে বাংলাদেশি পেলে! আরও লক্ষ করেছি–বাংলায় ওরা কথা বলে না।

নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত যাতায়াতে কলকাতায় রেল বাহনই সেরা। চল্লিশ দিন আগে থেকে উড়িষ্যার পুরীগামী সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের টিকিট কাটা ছিল অনলাইনে। ২২ জুলাই ভোর ৬টায় ট্রেন ছাড়বে। ভুবনেশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা। টালিগঞ্জ থেকে হাওড়া নতুন ২ নম্বর প্লাটফর্ম পৌঁছে গেছি ভোর ৫টায়। চালক সঠিক ভাড়া নিল। কিন্তু বড় ধরনের ধাক্কা খেলাম হাওড়া স্টেশনের ট্রলিওয়ালা কুলির কাছ থেকে। হিন্দি বলতে পারি না! সত্তরের ওপরে বয়স্ক লাল গেরুয়া বসনের কুলির সর্দার হিন্দিতে ৫টি ল্যাগেজের জন্য ১৫০০ রুপি দাবি করে বসল। নতুন জায়গা। গিন্নি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে রাজি করাল ৮০০ রুপিতে। যা কিনা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের আরামদায়ক একটি চেয়ার কোচ আসনের ভাড়ার চেয়ে ৪ শ' রুপি বেশি! ১৮ নম্বর প্লাটফর্ম যেতে সময় লাগল মাত্র ৬ মিনিট। গাড়িতে যাত্রী আসনের নির্ধারিত জায়গায় মালামাল তুলে দিলো পর যুবক কুলি।

সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বন্দে ভারত নির্ধারিত সময়েই হাওড়া থেকে পুরী অভিমুখে যাত্রা করল। বেশ পরিষ্কার ট্রেনটি। আছে কিছুক্ষণ পরপর নানা খাবারের বাহার। স্ত্রী, কন্যা ও পুত্র পাশাপাশি তিন আসনের ডান দিকে। আমার পাশের আসনে সহযাত্রী শুভাশিস দাস। বালেশ্বর স্টেশনে এসে পরিচয়। যাবেন কটক। ভদ্রলোক মেরিন এখতিনি থাকেন সুইডেন, জাহাজে। গিন্নি হুগলীর শ্রীরামপুরের শেওড়াফুলি একটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। একমাত্র ছেলে স্মার্ট ফোনে আসক্ত! কলকাতার পড়াশোনার মান একেবারে নেমে গেছে। জানালেন তিনি। তাই ছেলেকে মানসম্পন্ন শিক্ষার অভিপ্রায়ে ভুবনেশ্বরের আবাসিক প্রতিষ্ঠান সাই ইন্টারন্যাশন্যাল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। ছাত্রাবাসে থেকে ছেলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ছে। মাসিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় তার ছেলের বাজানো গিটারের সুরের ভিডিয়ো ক্লিপ দেখালেন তিনি। বললেন, প্রকৌশল বিষয়ে ভুবনেশ্বরের KIIT মানে কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অব ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি ভারতের বেশ নামকরা প্রতিষ্ঠান। 'আপনার মেয়ে সঠিক জায়গায় এসেছে।' খড়গপুর পার হবার পর ট্রেনে যেতে যেতে দেখলাম ফসলের মাঠ আর মাঠ। আশপাশে মানুষের বসতি নেই।

মন্দির রাজধানী বলে খ্যাত উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে ছিলাম চারদিন। ভুবনেশ্বর শহরের পুরাতন রেল স্টেশন মোড়ে সাই বাবার মন্দির দর্শন করেছি আমরা। রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার এবং সবাই শৃঙ্খলিত। রাস্তার মোড়ে এক পাশে বেশ কিছু বিল বোর্ড। তাতে উড়িষ্যার মুখমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের আলোকচিত্র। তাতে তিনি নমস্কারের ভঙ্গীতে শহরের সকলকে অভিনন্দন বার্তা জানাচ্ছেন। ভুবনেশ্বরের জনগণ খুব আন্তরিক। কলকাতার মতো এখানে বাইক খুব একটা নেই। কেউ ময়লা রাস্তায় ফেলে

পুরী জগন্নাথ মন্দিরের সামনে লেখক

না। ভেজ আইটেম সস্তা। রাস্তার (স্ট্রিট) দোকানগুলোর খাবারের দাম কম এবং তা সুস্বাদু ও জীবাণুমুক্ত। উড়িষ্যার ভাষা উড়িয়া; তা অনেকটা হিন্দির সহজ সংস্করণ। বাংলা ভাষার কাছাকাছি। ভুবনেশ্বরের মানুষ বাংলা বোঝে ভালোভাবেই। কিন্তু অটো ও ট্যাক্সিচালক বাংলাদেশি পেলে চলমান ভাড়ার চেয়ে বেশি আদায় করতে ছাড়ে না, তা প্রমাণ পেলাম। শহরের রাস্তার দুপাশের বিনা ভাড়ায় পার্কিং স্থান বেশ চোখে পড়েছে। পর্যটকবান্ধব হোটেলগুলো। সকল শ্রেণির লোকদের জন্য থাকা ও খাওয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে। শহরের পটিয়ায় কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অব ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি (কিট)। ২০০ একর জমির ওপর এর বিশাল ক্যাম্পাস। কিটের সহযোগী প্রতিষ্ঠান KISS। মানে কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্স। কিট ও কিসের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষাব্রতী প্রফেসর অচ্যুত সামান্তা বেশ দয়ালু এবং আধুনিক সমাজ কর্মঠ সজ্জন মানুষ। তিনি গরিব আদিবাসীদের এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস ও কর্মযোগের ব্যবস্থা করেছেন। তাদের তৈরি বিভিন্ন ধরনের পণ্য সুলভ মূল্যে ব্যবহার করছে কিট ও কিসের সংশ্লিষ্টরা। শিশু শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক স্তরের ৮০ হাজার অনাথ ও অসহায় শিশুদের তিনি বিনামূল্যে বহন করার দায়িত্ব নিয়েছেন। বাংলাদেশে উচ্চতর শিক্ষায়ও সামান্তার অবদান রয়েছে। কিটের অভ্যন্তরে সুরম্য ইমারতের পাশে পরিচ্ছন্ন পথের ঘন সবুজ বৃক্ষতল। দৃষ্টিনন্দন ভুবনেশ্বরের পটিয়াও। পথচারী পারাপারের পথ বিঘ্ন না করে ফুটপাতে সস্তায় দোকানি খাবার সেবা দিচ্ছে। সেও অনলাইনের পেটিএম কার্ড ব্যবহার করছে এবং মূল্য নিচ্ছে।

উড়িষ্যার রাজ্যে এসে পুরীর জগন্নাথ মন্দির দর্শন করব না তা কি হয়? ভুবনেশ্বর থেকে পুরীর দূরত্ব প্রায় ৬৪ কিলোমিটার। এসি বাসে সময় লাগে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট। জনপ্রতি ভাড়া ৬০-৮০ রুপি। নন এসি বাসে ভাড়া ৩০-৪০ রুপি। ভুবনেশ্বর কল্পনা স্কয়ার মোড় থেকে একদিন সকালে পুরী বাসে করে ৪ জন রওনা দিলাম। সকালের হিমেল হাওয়ায় দেড় ঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম আমরা পুরী বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে ব্যাটারিচালিত ইজি বাইকে চড়ে ৭ মিনিটে মন্দির পৌঁছি। খালি পায়ে কোনো দ্রব্য ব্যতিত জগন্নাথ মন্দিরে যেতে হয়। তপ্ত রোদে হাত তুলে 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি তুলছে ভক্তরা। ২৭ মিনিট পাকা রাস্তায় পার হয়ে একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন। সম্ভবত পাণ্ডা! তল্লাশিরত পুলিশ বাধ সাধল। সেলফোন সেট রেখে আসতে হবে। আমার যাওয়া হলো না মন্দিরের ভেতর। মন খারাপ যেমন হলো, তেমনি অচেনা জায়গায় পরিবারের সবাইকে হারানোর শঙ্কায় শুধু ঘামছি আর ছিটানো জলে খালি পা রাখছি। পর্যটক বিশেষ করে বিদেশিদের জন্য সুবিধা থাকা প্রয়োজন। পুরী জগন্নাথ মন্দিরের আশপাশে কটেজ ও রাত্রিবাসের হোটেলগুলো অনেকটা পর্যটকমুখী। দুপুরের আহার শেষে এসি বাসে করে ভুবনেশ্বর পুরাতন রেল স্টেশনসংলগ্ন হোটেল গ্রান্ড সেন্ট্রাল। কিটের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে গিয়ে কন্যা প্রমিতি মজুমদারের ভর্তির প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করি। মেয়েদের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে তুলে দিয়ে ২৬ জুলাই দুপুরে কলকাতায় রওনা হব বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে। হোটেলে ফিরে তিনজন বিশ্রাম ও স্নান শেষে কাছের রেস্টুরেন্ট সোয়াদিষ্ট গিয়ে দুপুরের আহার সেরে নেই। মালপত্র নিয়ে গ্রান্ড সেন্ট্রাল হোটেল থেকে চেক আউট হই দুপুর ২টা ১০ মিনিটে। রিসিপশনের দায়িত্বে দুর্গা ভৌমিক বেশ আন্তরিক। প্রায় অর্ধেক ভাড়ায় টিভি, ফ্রিজ, ইলেক্ট্রিক কেটলির ব্যবস্থায় সার্বক্ষণিক ওয়াই ফাই সুবিধায় আমাদের অত্যাধুনিক বড় কক্ষ দিয়েছেন। তাঁর স্বামী অনির্বাণ ভৌমিকের পিতা ছিলেন আমার জন্মস্থান চাঁদপুরের। হোটেল ত্যাগের সময় তাঁর চোখও ছলছল করছিল। ট্রেনে বসে মেয়ের একা থাকার কথা যেমন ভাবছিলাম; তেমনি মনে পড়ছিল হোটেল সোয়াদিষ্ট এর ভদ্র ছেলেটির নিষ্পাপ মুখ। যে অমিত শর্মা দুপুর রাতে ৬ বেলা হাসিমুখে আমাদের খাবার সরবরাহ করেছেন ভেজ থালি, নুডলুস ও এগরোল। রাত ৮টায় হাওড়া স্টেশনে নেমে চাকাওয়ালা ল্যাগেজ হাতে নিয়ে বের হচ্ছি। চোখে পড়ল আইআরসিটিসি (ভারতীয় রেল ক্যাটারিং ও পর্যটন নিগম) এর কুলি ভাড়াসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির ওপর। পড়ে দেখলাম লোহার ট্রলি করে মালপত্র নিতে একজন কুলির নির্ধারিত মজুরি মাত্র ৩৭ রুপি। বেশ প্রতারিত হয়েছি ভেবে কষ্ট পেয়েছি অনেক।

কলকাতায় একদিন এক রাত থেকে ২৮ জুলাই ভোরে ৩ জন দেশে ফেরার উদ্দেশে সৌহার্দ্য বাস ধরি। নীরব কলকাতা শহর। বলতে গেলে যানশূন্য। ফাঁকা রাস্তা। ট্রাফিক সিগন্যালের লালবাতিগুলো মেনে গাড়ি চালাচ্ছে ট্যাক্সি চালক। যা দেশে দেখা যায় না। আমাদের মহাসড়কগুলো সিগন্যাল বাতিই তো নেই এখন! খারাপ লাগল কলকাতা ভ্রমণে এবার। হিন্দি ভাষার দাপটে বাংলা অসহায়। ভ্রমণে কষ্ট পেয়েছি হাওড়া সিটি পুলিশ নিয়ন্ত্রিত প্রিপেইড ট্যাক্সি ভাড়া কাটতে গিয়ে। হাওড়া থেকে টালিগঞ্জ রিজেন্ট পার্ক ভাড়া ১২৬ রুপি। অথচ পোস্টপ্রেইড ট্যাক্সি ভাড়ায় আমাদের আড়াই থেকে ৪ গুণ বেশি ভাড়া বহন করতে হয়েছে।

কলকাতার জনগণের চেয়ে ভুবনেশ্বরের জনগণ বেশি আন্তরিক। তবে আমরা বেশি বন্ধুবৎসল। বাংলা ভাষাকে বেশি ভালোবাসি আমরা। •

প্রণব মজুমদার
কথাসাহিত্যিক, কবি ও সাংবাদিক

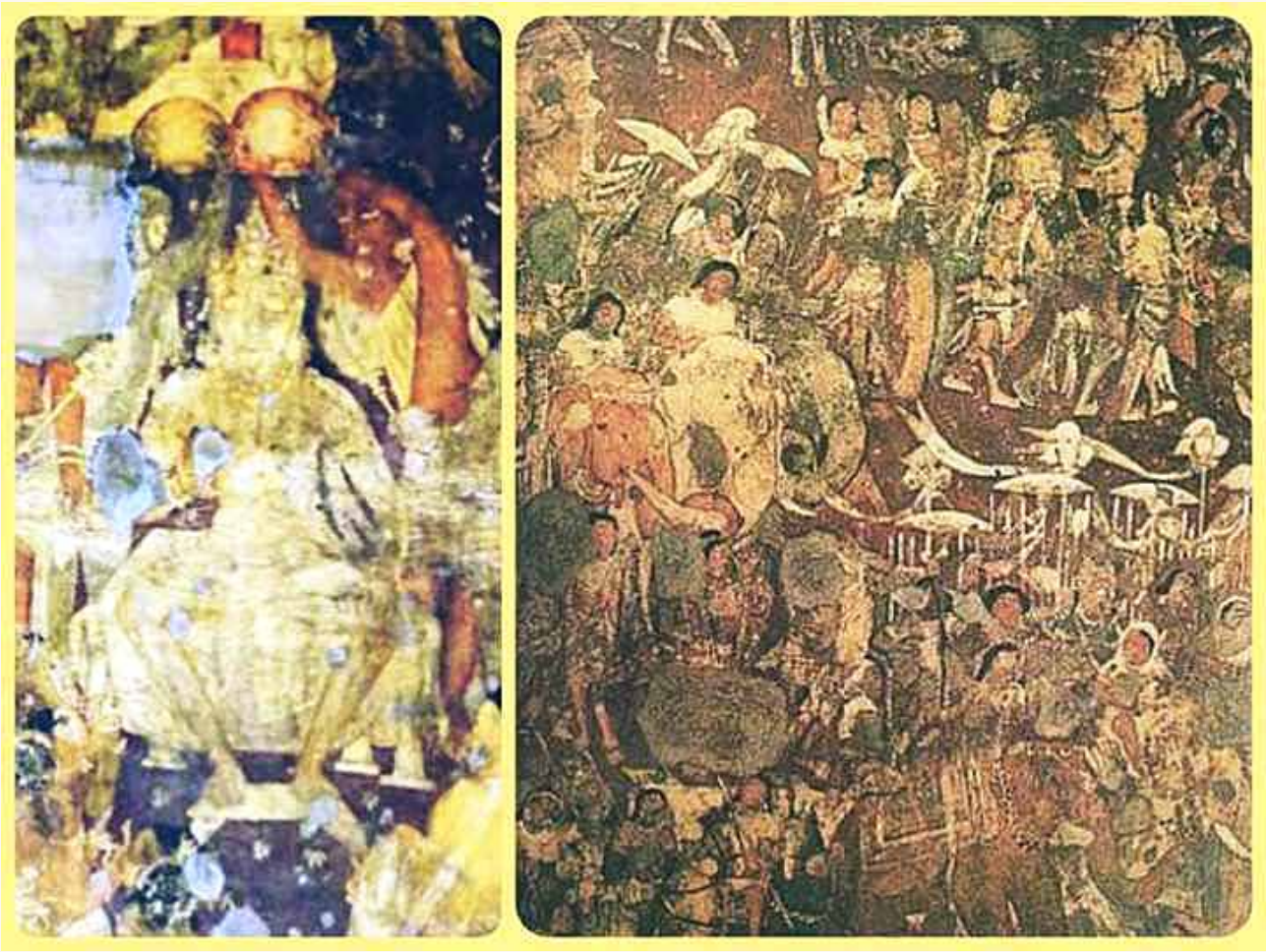

রাজকুমার বিজয় সিংহের রাজ্যাভিষেক

ভূমিপুত্র বিজয় সিংহ

বিস্মৃতির অতলে বাঙালি বীর

জ্যোতির্ময় সাহা

ইতিহাস

বাঙালি বীর বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করেন। তার এ বিজয় প্রশংসনীয় ছিল। তাই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গর্বভরে লিখেছেন–

একদা যাহার বিজয়-সেনানী, হেলায় লঙ্কা করিল জয়।
একদা যাহার অর্ণবপোত, ভ্রমিল ভারত সাগরময়॥
তুই কি না মাগো তাদের জননী, তুই তো না মাগো তাদের দেশ।
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ?

এই দেশ বিদ্রোহের দেশ, শান্তশিষ্টদের আবাসভূমি নয়। বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ চৈতন্যদেবও বাংলার সুবোধ সন্তান ছিলেন না, বাল্যকালে অতি দুরন্ত ছিলেন। তিনি সনাতন ধর্মের প্রাচীন সমাজের প্রথম এবং প্রধান বিদ্রোহী ছিলেন। এই বিদ্রোহে আধুনিক সময়ে রামমোহন রায় এবং গান্ধী প্রবর্তিত নীতিতে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভিত নড়ে পড়েছিল। চিন্তার সঙ্কীর্ণতা, কোনো ধর্মমতের অস্বাভাবিক অনুজ্ঞা বাঙালি বেশিদিন সহ্য করেনি। বাঙালি কোনো কালেই স্বাধীনতার ডাক অগ্রাহ্য করেনি

সংগ্রামী নেতা তিতুমীর স্বাধীনতার জন্য প্রথম জীবন দিয়েছিলেন; 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো'–শ্রেষ্ঠ বাঙালি নেতাজি সুভাষ বসুর এমন ডাকে অসংখ্য বাঙালি বিপ্লবী আত্মাহুতি দিয়েছিলেন 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ'–হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে জীবন উৎসর্গ করে ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েম করেছে।

২.

বিদ্রোহী রাজকুমার : এই বিদ্রোহের দেশে ঐতিহাসিক যুগের প্রথম দিকে আমরা এক বিদ্রোহী রাজকুমারের দেখা পাই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'হে মাতঃ বঙ্গভূমি! তুমি তোমার সন্তানদের আর শান্তশিষ্ট করে রেখো না–তাদের গৃহহীন ছন্নছাড়া করে দাও।' রাজকুমার বিজয় বঙ্গমাতার এক গৃহতাড়িত ছন্নছাড়া সন্তান ছিলেন। বাঙালির অগণিত অজানা বীরদের মধ্যে অন্যতম অগ্রদূত বঙ্গদেশের রাজা বাঙালির রাজা বিজয় সিংহ। লঙ্কা বিজয়ী বীর বিজয় সিংহ বাঙালি ছিলেন এ বিষয়ে দ্বিমত করার অবকাশ নেই। বিজয়ের মাতৃভূমি মগধ ও বঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে। রাঢ়বঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের (অধুনা বীরভূম, বাকুড়া, মেদিনীপুরের একাংশ এবং বর্ধমান ও হুগলি জেলা) রাজা ছিলেন প্রবল পরাক্রমশালী ও প্রজাবৎসল সিংহবাহু। রাজার কীর্তিতেই বাংলার এই প্রাচীন জনপদ পরিচিতি পায় সিংহপুর নামে, যা অধুনা হুগলি জেলার সিঙ্গুর নামে থিতু। তৎকালে পূর্বভারতে দুটি প্রধান নগর ছিল। একটি গৌড় অপরটি সিংহপুর। এই বিজয় কর্তৃক সিংহল বিজয় বাঙালির ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। বৈদিক যুগের পরবর্তী কালের এই কাহিনির সূত্রপাত খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে অর্থাৎ আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে। তথাগত বুদ্ধ তখনো এই ধরাধামে অবতীর্ণ হননি।

আজ যে দেশটাকে আমরা শ্রীলঙ্কা বলে জানি ১৯৭২ সাল অবধি এই দেশটির পূর্ব নাম ছিল সিলোন বা সিংহল। মাত্র সাতশত সৈন্য নিয়ে বাংলার প্রাচীন তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) বন্দর থেকে অজানার পথে ২২২২ কিমি তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি পাড়ি দিয়ে বিজয় সিংহের নেতৃত্বে একদল অদম্য সাহসী বাঙালি দারুচিনির গন্ধমাখা শ্রীলঙ্কা বিজয় করে নিজেদের নামে একটি রাষ্ট্র, একটি জাতি, একটি ভাষা, একটি পতাকার জন্ম দিয়েছিল যার অস্তিত্ব আজও বর্তমান। সেই রাষ্ট্রের নাম সিংহল। জাতির নাম সিংহলি। এই সিংহলের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে পালি ভাষায় দ্বীপবংশ এবং পরে মহাবংশ ও কুলবংশ নামক পুঁথিতে বাংলার সিংহবাহু তনয় বিজয়ের বিজয়গাথা লিপিবদ্ধ করেছেন। আজও অজন্তা গুহায় বিজয় সিংহের সিংহল অভিযানের সচিত্র উপস্থিতি বিরাজমান। বিজয় সিংহের এই কাহিনি উল্লেখ করেই 'আমরা' কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন–

আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়,
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
... ...
একহাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লিনাথে।
... ...
বাঙালির কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান
বিফল নহে এ বাঙালি জনম, বিফল নহে এ প্রাণ।

৩.

স্বাধীনচেতা বাঙালি রাজকন্যা : সেই সময় বঙ্গের রাজার এক কন্যা ছিল। নাম সুসিমা। এই কন্যা সুন্দরী তবে স্বাধীনচেতা ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিল। রাজপ্রাসাদে এজন্য তাকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হতো। সুসিমা তা সহ্য করতে না পেরে একদিন গোপনে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সেসময় একদল বণিক বঙ্গ হতে মগধ যাচ্ছিলেন। রাজকন্যা তাদের সঙ্গ ধরলেন। পথে রাঢ় দেশে (মগধ এবং বঙ্গের মধ্য স্থান) এক সিংহ (সম্ভবত সিংহ উপাধিধারী কোনো ডাকাত সর্দার) দলপতি অর্থলুব্ধ হয়ে বণিকদিগকে আক্রমণ করলে বণিকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করল। কিন্তু রাজকুমারী কামাতুরা হয়ে তাকে ভজনা করলেন। সিংহের ঔরসে সুসিমার দুটো সন্তান জন্মাল। এরা উভয়ই পরম সুন্দর ছিলেন। পুত্রের নাম সিংহবাহু আর কন্যার নাম সিংহসিবলী। ষোলো বছর সিংহের সঙ্গে বাস করে বীতস্পৃহা জাগলে রাজকুমারী পুত্র কন্যা নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে তার পিতৃরাজ্য বঙ্গের উপান্তভাগে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন বঙ্গের রাজার এক ভাইপো (সুসিমার কাকাতো ভাই) শাসন করছিলেন। তিনি সুসিমার এই কাহিনি শুনে চমৎকৃত হয়ে রাজধানীতে নিয়ে বিয়ে করে ফেললেন। এদিকে সিংহ তাদের খুঁজতে খুঁজতে বঙ্গের উপান্তে তথাস্থানে উপস্থিত হয়ে উপদ্রব শুরু করল। সিংহবাহু পিতা সিংহকে হত্যা করল। সিংহবাহুর অপুত্রক মাতামহ বঙ্গেশ্বর কদিন পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহবাহু বঙ্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু তার মাতা সুসিমা বঙ্গেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিবাহ করায় সিংহবাহু তার মাতামহের রাজ্য মাতার স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে যেখানে তিনি আশৈশব পালিত হয়েছিলেন (অর্থাৎ রাঢ় দেশে) সেখানে বিস্তীর্ণ জঙ্গল সাফ করে সিংহপুর নামক রাজ্য স্থাপন করেন। সিংহপুর রাঢ়ের অতি প্রাচীন রাজধানী। বল্লাল সেনের ২৭টি কুলস্থানের মধ্যে সিংহপুর একটি। সিংহপুর একসময় কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল। কলিঙ্গরাজ এত পরাক্রমশালী ছিলেন যে সম্রাট অশোক একলাখ সৈন্য ধ্বংস এবং বহু লাখ সৈন্য আহতের বিনিময়ে কলিঙ্গ জয় করেছিলেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে এই স্থানটি আজকের সিঙ্গুর। কিন্তু রানি ছাড়া রাজ্য চলবে কীভাবে। সিংহবাহু বোন সিংহসিবলীকে বিয়ে করলেন। (এখানে বলা যেতে পারে বঙ্গদেশটা তখনো আর্য সংস্কৃতির দখলে পুরোপুরি আসেনি। সমাজে হয়তো এমন নিয়ম ছিল। মিশরের ফ্যারাওদের মধ্যে ভাই-বোনের মধ্য বিবাহের রেওয়াজ ছিল)। যাহোক তাদের অনেক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বড় পুত্র বিজয় সিংহ। আরেক পুত্রের নাম সুমিত সিংহ।

৪.

যুবরাজ বিজয় সিংহ : রাঢ়ের যুবরাজ বিজয় সিংহ। তাঁর অনেক অনুচর ছিল। রাজার অবর্তমানে রাজ্য শাসন ঘাড়ে পড়বে, এগুলো জানার পরেও নিজেকে তৈরি করার কোনো চেষ্টা তাঁর মধ্যে ছিল না। বিজয় সিংহ শৈশব-কৈশোরে দস্যিপনা করতেন। দলবল নিয়ে সারাদিন চারদিকে উপদ্রব আর উৎপাত করে বেড়ানোই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। তাঁর আর তাঁর দলবলের নাম শুনলেই প্রজারা ভয়ে শিউরে উঠত। প্রতিকারের আশায় প্রজারা মাঝে মাঝে রাজদরবারে অভিযোগ জানাত। কিন্তু সিংহবাহুরও নিয়ন্ত্রণের বাইরে তখন সবকিছু। শুরুতে উপদেশ, পরে তিরস্কার, তারও পরে তিনি উত্তরাধিকার হরণের ভয় দেখালেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই কোনো কাজ হলো না। মহারাজা সিংহবাহুর নিকট পুত্র বিজয় সিংহের নামে প্রজাদের ওপর উৎপীড়ন ও নিপীড়নের অসংখ্য অভিযোগ আসতে থাকলে সিংহবাহু বিজয় সিংহকে রাজ্য ত্যাগের আদেশ দেন। দ্বীপবংশে লেখা আছে উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য রাজা সিংহবাহু বিজয়কে না মেরে দণ্ডের এরূপ ঘোষণা দিলেন–'এই বালককে এ রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দাও। নইলে রাজ্যে শান্তি আসবে না। এর সমস্ত দাস-দাসী-সহচর ও তাদের স্ত্রীপুত্র কেহ যেন আর এ দেশে না থাকে। জাহাজে ভাসিতে ভাসিতে ইহারা যেখানে ইচ্ছা যাউক, আর যেন ইহারা স্বদেশে মুখ দেখাইতে বা বাস করিতে না আসে।' উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের একটা বই আছে। নাম 'বঙ্গের বীর-সন্তান'; বইটি ১৯৪৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দ্রুত-পঠন পাঠ্য বই হিসেবে অনুমোদিত ছিল। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের মতে বিজয়ের বিরুদ্ধে প্রজাপুঞ্জের প্রতি অত্যাচারের যে অভিযোগ উঠেছিল তা মিথ্যা। মূলত বিমাতাদের ষড়যন্ত্রেই এই অভিযোগনামা নেমে এসেছিল তাঁর ঘাড়ে।

৫.

অজানার উদ্দেশে যাত্রা : তাম্রলিপ্ত বন্দরে প্রস্তুত হলো তিনখানা বিশাল অর্ণবপোত। অতঃপর বিজয় পরিকর পরিবৃত হয়ে শিশুমণ্ডলী, মহিলামণ্ডলী এবং নিজের সাতশত সহচর পৃথক তিনটি জাহাজে অজানার উদ্দেশে রওয়ানা হন। প্রথমটিতে উঠলেন বিজয় সিংহ ও তার সাতশত সহচর, দ্বিতীয়টিতে তাদের সাতশত সহধর্মিণী আর তৃতীয়টিতে তাদের পুত্র-

যক্ষরাজ কালসেন অবাক বিস্ময়ে আগন্তুক দলকে নিরীক্ষণ করলেন। লঙ্কারাজের বিশ্বাস ছিল–'এ যক্ষের দেশ লঙ্কা কেহ অধিকার করিতে পারিবে না।' তিনি সাতশত বাঙালির এই স্পর্ধায় উপহাসের হাসি হেসে, তাদের শিক্ষা দেবার নিমিত্ত এক বিরাট সেনাদল প্রেরণ করলেন

কন্যারা। আহার বিহারের সমস্ত উপকরণই ছিল। জাহাজের কাপ্তানরা ছিল পারদর্শী। অতঃপর জাহাজ নদীর মোহনা ছাড়িয়ে সীমাহীন সমুদ্রের নীল জলরাশির ঢেউ পাড়ি দিয়ে ছুটে চলল অজানার উদ্দেশে। বাঙালি ইতিহাস সৃষ্টি করতে। একদিন দেখা গেল আকাশজুড়ে কালো মেঘ, সাথে গর্জন। উঠল ঝড়। ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজ দল থেকে আলাদা হয়ে গেল। শিশুদের জাহাজ নগ্নদ্বীপে (ড. দীনেশচন্দ্র সেন একে পূর্ব উপকূলের নেগাপত্তম বলে চিহ্নিত করেছেন), মহিলাদের জাহাজ সুদৃঢ় এক রাজ্য মহিলা-দ্বীপে (ড. দীনেশচন্দ্র সেন একে মহিদ্বীপ বলে চিহ্নিত করেছেন। মহিদ্বীপ এককালে ফরাসিদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ভিন্নমতে এটি মালদ্বীপ।) আশ্রয় গ্রহণ করে। আর বিজয়ের জাহাজ পথ হারিয়ে পৌঁছে গেল সুপ্পারক বন্দরে (এটি সোপারা বা সোরপারক নামেও পরিচিত, মুম্বাইয়ের নিকট একটি প্রাচীন বন্দর)। এখানকার অধিবাসীরা বিজয়কে যথেষ্ট ভদ্রতা ও সৌজন্য দেখায়। কিন্তু তিনি এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা নারীদের ওপর নানান ধরনের অত্যাচার শুরু করেন। এই সমস্ত হঠকারী আচরণে অতিষ্ট হয়ে সেখানকার সব লোক একত্র হয়ে ঘোষণা দেয়–এই দূরাত্মাদের হত্যা করা হোক। অতএব বিজয় বাধ্য হয় সাথিদের নিয়ে আবার সমুদ্রে জাহাজ ভাসালেন, যাত্রা শুরু করলেন দক্ষিণ দিকে।

৬.

সিঙ্গুর থেকে সিংহল জয় : আবারও শুরু হয় বিজয়ের অজানা সমুদ্রযাত্রা। চারদিকে শুধু জল আর জল। স্থলের কোনো সন্ধান নেই। সঞ্চিত খাবার কমে আসছে। কমে আসছে জমানো পানি। এইভাবে আর কয়েকদিন চললে সব শেষ হয়ে যাবে। এমন সময়ে দিগন্তের ওপারে ভেসে ওঠে গাছের সারি। যখন বিজয়ের সঙ্গীরা দ্বীপে নেমে ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে মাটির ওপর হাত রেখে বসলেন তখন তাদের করতল লাল মাটির গুণে লাল বর্ণ ধারণ করে। এজন্য সে স্থানের নাম রাখেন তাম্রপর্ণী দ্বীপ–আজকের শ্রীলংকা। শুরু হলো নতুন ইতিহাসের সূচনা। যক্ষরাজ কালসেন অবাক বিস্ময়ে আগন্তুক দলকে নিরীক্ষণ করলেন। লঙ্কারাজের বিশ্বাস ছিল–'এ যক্ষের দেশ লঙ্কা কেহ অধিকার করিতে পারিবে না।' তিনি সাতশত বাঙালির এই স্পর্ধায় উপহাসের হাসি হেসে, তাদের শিক্ষা দেবার নিমিত্ত এক বিরাট সেনাদল প্রেরণ করলেন। বৃহৎ বৃহৎ শেতকায় হস্তী ও উচ্চ তেজস্বী অশ্বসমূহে লঙ্কার তীরভূমি পরিপূর্ণ হল। লঙ্কা জয়ের জন্য বিজয়ের বীর হৃদয় নেচে উঠল। বিজয় বললেন, 'বন্ধুগণ, আমরা এই রাজ্য জয় করে এখানেই বসবাস করব। তোমরা প্রস্তুত হও। আমি রাজাকে যুদ্ধে আহ্বান করলাম।' সাতশত বঙ্গবীরের শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত স্রোত ছুটিল; বাণপূর্ণ তূণে পৃষ্ঠদেশ শোভিত হলো; কটিতে অসি ঝনঝন করে উঠল; সমুন্নত বর্শা হস্তে তারা তীরে এবং জাহাজের উপর সারি বাঁধিয়া দাঁড়াল। লঙ্কার উপকূলে সেদিন নিরাশ্রয়, বিদেশি, সাতশত বাঙালি মত্ত হস্তীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগল। বিজয় সিংহ কালন্তক যমের মতো লঙ্কাসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। নিক্ষিপ্ত তিরের শনশন শব্দ, হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষা, সৈন্যের চিৎকার–এই সমস্ত মিলে এক মহাপ্রলয়ের শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হলো। লঙ্কারাজ, তাঁহার বহু সৈন্য নিহত হচ্ছে শুনিয়া, স্বর্ণময় রাজছত্র মস্তকে দিয়ে, শ্বেতহস্তিপৃষ্ঠে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসলেন। লঙ্কার সেনাদল আবার নবতেজে যুদ্ধ করতে লাগল; কিন্তু বিজয় সিংহের অদ্ভুত সাহস ও অলৌকিক বীরত্বের কাছে তারা বেশিক্ষণ টিকতে পারলেন না। বিজয়ের নিক্ষিপ্ত এক বর্শার আঘাতে লঙ্কারাজ নিহত হলেন। অবশিষ্ট সৈন্যগণ বিজয় সিংহকে দৈববলে বলীয়ান মনে করে, আত্মসমর্পণ করে তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা করল। বিজয় সিংহ লঙ্কা অধিকার করলেন। লঙ্কার রাজপ্রাসাদে, দুর্গভালে বাংলার রাজপতাকা উড়ল। বীরশ্রেষ্ঠ বাঙালি বিজয়ের নেতৃত্বে মাত্র সাতশো সেনা নিয়ে লঙ্কার রাজাকে পরাস্ত করেন। বিজয়ের পিতা সিংহ বধ করার কারণে স্থানটির নাম রাখেন সিংহল। এ কারণে বিজয়ের লোকজনেরাও সিংহলী নামে অভিহিত হতেন। এখান থেকেই সিংহল ইতিহাসের সূচনা হয়। বিজয় সিংহের এই জয়ের কাহিনি বৌদ্ধ গ্রন্থ দ্বীপবংশ, মহাবংশ, কুলবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ আছে। লংকা দখল করে নেয় একদল বাঙালি। তাঁর বংশের নামানুসারে এর নাম রাখলেন সিংহল। তাম্রপর্ণীতে স্থাপিত হলো রাজধানী। ভারত থেকে শ্রীলঙ্কা। সিঙ্গুর থেকে সিংহল অবধি বিজয়ের বিজয়রথের উপাখ্যান বাঙালির স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখিবার বিষয়।

৭.

বিবাহ এবং রাজ্যাভিষেক : বিজয়ের মন্ত্রীদিগের মধ্যে সেখানে কেউ কেউ নতুন নগর স্থাপন করেছিলেন, স্ব-নামে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এভাবে সেদেশের অধিকার স্থাপিত হলে সকলে বিজয়ের নিকট প্রার্থনা করেন–'আপনি আমাদের রাজপদে অভিষিক্ত হউন।' বিজয় বললেন–'যদি উচ্চকূলের কোনো রমণী রাজ্ঞী হয়ে আমার সঙ্গে অভিষিক্ত না হন তবে সহধর্মিণী ছাড়া কিছুতেই আমার অভিষেক হতে পারে না।' তাঁর আমাত্যবর্গ চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেননি। তাঁরা প্রচুর মণি মুক্তা ও দামি সামগ্রীসহ দক্ষিণ ভারতের রাজা পাণ্ডুর কন্যার সাথে বিজয়ের সম্বন্ধের প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠালেন। সেই সাথে তাদের নিজেদের জন্যও পাত্রী সন্ধানের প্রস্তাব দিলেন। দূতেরা জাহাজে চড়িয়া মাদুরায় উপস্থিত হয়ে রাজাকে সে সকল উপঢৌকন ও পত্র প্রদান করেন। রাজা মন্ত্রীগণের সাথে শলাপরামর্শ করে প্রস্তাবে রাজি হয়ে বিজয়ের মন্ত্রীদের জন্য আরো একশত কন্যা প্রেরণের বিষয়টি নগরে ঢোল দিয়ে জানান দেওয়া হলো। অতঃপর রাজা স্বীয় কুমারীকে নানারূপে অলঙ্কার ও ব্যবহার্য সামগ্রী এবং পথের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করলেন। অন্যদেরও উপযুক্ত বেশভূষা দিয়ে সজ্জিত করলেন। রাজদূত পাণ্ডু রাজার পত্রসহ মহারাজ বিজয়ের জন্য এই সকল উপঢৌকন ও কুমারীদিগকে নিয়ে যাত্রা করলেন। এই বিপুল জনতা লঙ্কার মহাতীর্থ নামক স্থানে জাহাজ হতে অবতীর্ণ হলেন। স্থানটি স্মারক চিহ্ন হিসেবে পরিগণিত হয়ে রইল।

(এ বিষয়ে একটি উপকথা আছে যে, আগে বিজয় এক যক্ষী কুবেণীর সাথে সংসার করেছিলেন। যক্ষরাজ কালসেনের রাজ্য জয়ের পরে বিজয়ের ভালোবাসা উবে যায়। কুবেণীর জীবনে নেমে আসে দুঃসময়। তিনি পরিত্যাগ করেন কুবেণীকে। তাদের দুটি পুত্র কন্যা ছিল। নতুন রাজরানি এসে যাতে এসব জানতে না পারে সেজন্য বিজয় যক্ষীকে সহস্রমুদ্রা দিয়ে চলে যেতে বলল। যক্ষী সন্তান দুটিকে নিয়ে লঙ্কায় চলে গেল। সেখানে এক যক্ষ চিনতে পেরে মুষ্টীর আঘাতে যক্ষীকে মেরে ফেলল। সন্তান দুটি দ্রুত সুমনকোটে চলে যায়। বালকটি বড় ও কন্যাটি ছোট ছিল। বালক বয়স্থ হলে নিজ ভগিনীকে বিবাহ করল। তাদের বংশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। যখন বৃহৎ পরিবারে পরিণত হলো তখন তারা রাজার আদেশ নিয়ে মলয় পর্বতে বাস করতে লাগল। এরা পুলিন্দ নামে খ্যাত হয়)।

পাণ্ডু রাজার দূতেরা বিজয়কে রাজকন্যাসহ সকল রত্নাদি ও কুমারীদের অর্পণ করল। বিজয় দূতদের সংবর্ধনা দিয়ে সম্মান জানালেন। কুমারীদের সাথে স্বীয় মন্ত্রী এবং সেনাপতিদের বিবাহ দিলেন। এবার মন্ত্রীরা রীতি অনুযায়ী অভিষেকের আয়োজন করলেন। বিজয় রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে পাণ্ডুকন্যাকে সমারোহের সাথে বিবাহ করলেন এবং তাঁকে রানির পদে অভিষিক্ত করলেন। এভাবে বিজয়ের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। অতীতের দুর্বৃত্ত জীবন পরিহারপূর্বক এই নৃপতি সমস্ত লঙ্কার অধিপতি হয়ে অতিশয় ন্যায়পরাণতার সাথে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। তাদের রাজত্ব শান্তিপূর্ণ এবং সুখময় হয়েছিল। বিজয় এভাবে আটত্রিশ বছরকাল রাজত্ব করেছিলেন। বিজয়ের পুত্র না থাকায় কষ্টে অর্জিত এই মহারাজ্য যাতে ধ্বংস না হয় সেজন্য সিংহবাহুর দ্বিতীয় পুত্র বিজয়ের কনিষ্ট ভ্রাতা সুমিত্রকে আসার জন্য পত্র লিখেন। সুমিত্র সে বছরই মারা যান। পরে বিজয়ের মৃত্যু হলে একবছর কাল লঙ্কাদ্বীপ রাজাশূন্য ছিল। অতঃপর সুমিত্রের কনিষ্ট পুত্র পাণ্ডুবাসুদেব সিংহলের রাজা হন। এরপর তৎপুত্র অভয়, এবং তৎপর তার ভাগিনেয় পাণ্ডুকাভয় ৭০ বছর সিংহলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তার পুত্র মুতাশিব ৬০ বছর এবং তার মৃত্যুর পর 'তির' সিংহলের রাজা হন। তার রাজত্বকালে খ্রি.পূর্ব ৩০৯ অব্দে মহেন্দ্র এবং সঙ্ঘামিত্র ধর্মের সুসমাচার প্রচারার্থে সিংহলে আগমন করেন। সিংহলীদের ইতিবৃত্ত-অনুসারে এরা অশোকের পুত্র-কন্যা। রাজা নিঃশঙ্ক মল্ল সিংহপুরের বিজয়ের বংশোদ্ভব। বিজয়ের সিংহলে পৌঁছিবার ১৭০০ বছর পর নিঃশঙ্ক মল্ল সিংহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সেই বংশোদ্ভূত মল্ল পরবর্তীতে কোনো সিংহরাজ উত্তরাধিকার না পেয়ে মূলস্থান সিংহপুরের রাজবংশের এক জ্ঞাতিকে আনিয়ে সিংহল রাজ্য তাঁকে প্রদান করেন।

তবে, বিজয় সিংহ ভালো মানুষ ছিলেন কী অত্যাচারী ছিলেন তা এখন গৌণ বিষয়। মুখ্য হচ্ছে, আড়াই হাজার বছর আগে উত্তাল জলরাশি পাড়ি দিয়ে বিজয় সিংহের নেতৃত্বে একদল অদম্য সাহসী বাঙালি লংকা জয় করেছিলেন। নিজেদের নামে একটি রাষ্ট্রের, একটি জাতির, একটি পতাকার, আর একটি ভাষার জন্ম দিয়েছিলেন–যার অস্তিত্ব আজো বর্তমান। ১৯৩৩ সালের ১৫ এপ্রিলে সিংহল গভর্নমেন্টের মন্ত্রী পেরিমসুন্দরম নয়াদিল্লিতে বক্তৃতায় গর্ব করে বলেছিলেন–'বাঙালি বিজয় সিংহ সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।'

৮.

সিংহলি এবং বাংলা ভাষার সাদৃশ্য : বিজয় সিংহ এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরদের কারণে সিংহলি ভাষার সাথে বাংলার অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সিংহলি ভাষাতাত্ত্বিক করুণাতিলকের মতে সিংহলি ভাষার উৎপত্তি হয়েছে পূর্ব ভারতে এবং এর অর্ধেকেরও বেশি শব্দের সাথে সিংহলী ভাষার নিকট সম্বন্ধ আছে। বাঙালির সঙ্গে সিংহলের সংস্রব বহু পূর্ব হতে চলে আসছে। বাংলার যেকোনো বণিক বাণিজ্যে যেতে হলে সিংহল যেতেই হতো। বস্তুত বাঙালিরা জাভা, বালি, সুমাত্রা, কম্বোডিয়া, শ্যাম, জাপান ও চীন প্রভৃতি বহু স্থানে সেই ইতিহাস-পূর্বযুগে উপনিবেশ স্থাপন করে কীর্তি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু বিজয়ের এই কীর্তি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অজন্তার বিশ্ববিশ্রুত চিত্রাবলির মধ্যে সিংহল দেশে বিজয়ের অভিযান শীর্ষক চিত্রটি সর্বচিত্রের মধ্যে উৎকৃষ্ট বিবেচিত হয়েছে। অজন্তার চিত্রাবলির ভূমিকায় কুমারী কোরাখের মন্তব্য–অজন্তা গুহার চিত্রাবলির দ্বিধাশূন্য নিখুঁত কলানৈপুণ্য বিশ্ববিশ্রুত, এই চিত্রাবলি অপরাপর সমস্ত চিত্রকে হার মানিয়েছে। তারপরও বঙ্গদেশ থেকে সিংহলে বসতি স্থাপনকারীগণ যে বাঙালি ছিলেন তার সপক্ষে দুধরনের যুক্তি উপস্থাপন করা যায়। প্রথম হলো ভাষা। দীনেশচন্দ্র সেন এই দুই প্রান্তের মানুষের ভাষার মিল খুঁজে পেয়েছেন। দুই ভাষার অসংখ্য শব্দের তালিকা করে এই মিলকে তুলে ধরেছেন। আর ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন–সিংহলী ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন–'সিংহলী ভাষার সঙ্গে অশোকের পূর্বভারতের লিপি ব্যবহৃত ভাষার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। ঐ ভাষা নিশ্চয়ই রাঢ় দেশের প্রাচীন ভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।' আমি সিংহলি জানি না–এই কথাটা সিংহলিতে হচ্ছে, 'মম সিংহলি দানে না'। আমি জানি না–এটা হচ্ছে, 'মম না দানিমি'। ও দেখে-হচ্ছে 'ওহু দাখি'। আর ওকে মার–হচ্ছে 'ওহু মার'। বুঝুন ঠেলা! দীনেশচন্দ্র সেনের মতে পূর্ববঙ্গের পল্লির ভাষার সঙ্গেই সিংহলির বেশি মিল। এইবার আমাদের বুক ফুলে ওঠা উচিত। দ্বিতীয়টি বৈজ্ঞানিক যুক্তি–জেনেটিক রিসার্চ। ১৯৯৬ সালে এস এস পাপিহা, সর্বজিত মস্তানা এবং আরো কয়েকজন মিলে তাদের রিসার্চ পেপারে উল্লেখ করেন যে, সিংহলীদের ওপর বাঙালিদের জিনগত প্রভাব ৭২%।

এ প্রসঙ্গে ড. দীনেশচন্দ্র সেন আগেই লিখেছিলেন, শুধু ভাষাতেই নয়, সিংহলিদের চেহারাও অবিকল বাঙালিদের মতোই। তিনি বলেন, 'বস্তুতঃ ধর্ম্মপাল, রেভারেণ্ড সিদ্ধার্থ, রেভারেণ্ড শীলানন্দ প্রভৃতি যতজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে আমরা দেখিয়াছি, প্রত্যেকের চেহারা অবিকল বাঙ্গালীর মতো। আমরা কয়েক স্থলে দেখিয়াছি, বাঙ্গালীরা কোন কোন সিংহলীর সহিত বাঙ্গালায় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া শেষে বিস্ময়ের সহিত আবিষ্কার করিয়াছেন যে, তাঁহারা ভিন্ন দেশবাসী–বাঙ্গালা বোঝেন না।'

রেভারেন্ড শীলানন্দ, যিনি ছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহলিজ ভাষার অধ্যাপক। তিনিও একই ধরনের মতামত দিয়েছেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, 'আমরা বহুদিন ধরেই এই ঐতিহ্য লালন করে আসছি যে, বঙ্গ থেকে বিজয় সিলোনে এসেছিলেন এবং খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এখানে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। এই ঐতিহ্য এসেছে বহু প্রাচীন কাল থেকে এবং প্রাচীন পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে আমরা তা জানতে পেরেছি। এই বিশ্বাস মহাবংশ, দ্বীপবংশ এবং অন্যান্য নথিপত্র দ্বারা নিশ্চিত হয়েছে এবং বাঙালি এবং সিলোনের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যকার অত্যাশ্চর্যজনক শারীরিক মিল থেকে সমর্থিত হয়েছে। সিংহলিজ রমণীরা হুবহু বাঙালি নারীদের মতো করে শাড়ি পরে। গত বছর যখন কয়েকজন সিংহলি নারী কোলকাতায় বেড়াতে এসেছিলেন, প্রথমে আমি তাদের বাঙালি ভেবেছি। একইভাবে কোনো সিংহলি যদি বাঙালি অধ্যুষিত কোনো শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, বাঙালিরা ভুলক্রমে তাদের নিজেদের লোক বলেই ভেবে নেবে। আমি শুনেছি, বাঙালিরা বলে যে, সিংহলিরা বাংলা একেবারে বাঙালিদের মতো করে বলে। যেখানে পার্শ্ববর্তী বিহার বা অন্য অঞ্চলের লোকেরা সারা জীবন বাংলায় থাকার পরেও নিখুঁত উচ্চারণে বাংলা বলতে পারে না। আঞ্চলিক একটা টান থেকেই যায়।' সিংহলিরা যে বাঙালিদের পূর্বপুরুষ জাত, সেব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ নাই। বঙ্গের সিংহপুরুষ বিজয় সিংহকে স্যালুট।

৯.

শ্রীলঙ্কার জাতীয় প্রতীক : বিজয় সিংহের বিজয়কে যারা কল্পনা বলে উপেক্ষা করেন বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। বিজয়ের সিংহাসন আরোহনের আরও ১০০ বছর পর ম্যাসিডোনিয়ায় জন্ম হয় আলেক্সান্ডারের, ৪০০ বছর পরে উত্থান হয় রোমান সাম্রাজ্যের আর ২০০০ বছর পর ভাস্কোডাগামার সমুদ্রতরণী ভেড়ে ভারত সমুদ্রবন্দরে। এসব বীরত্বের কাহিনি যুগযুগ ধরে প্রচার পেলেও বাংলার ভূমিপুত্র বিজয় সিংহ থেকে যায় বিস্মৃতির অতলে। বহুযুগ আগে পিতৃসত্য পালন করতে রামচন্দ্র স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষণকে নিয়ে শ্রীলঙ্কায় গমন করলে সেখানকার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করে। স্ত্রীকে উদ্ধারের উদ্দেশে বানর বাহিনী নিয়ে অসম যুদ্ধে জয়লাভ করে স্ত্রীকে উদ্ধার করে সেখানে প্রজাকল্যাণকারী ধর্মরাজের প্রতিষ্ঠা করে ফিরে আসেন নিজ ভূমিতে। হিন্দুদের অবতার রামচন্দ্র অমর হয়ে আছেন ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে। তার অনেক বছর পর পিতৃআজ্ঞায় নির্বাসিত যুবরাজ বিজয় সিংহও শ্রীলঙ্কায় এলেন এবং জয় করলেন। দুঃসাহসিক অভিযাত্রী অদম্য মনোবল ও অসামান্য নেতৃত্বের অধিকার, দক্ষ সংগঠক, অকুতোভয় সমরনায়ক, নিপুণ প্রশাসক এবং প্রজাবৎসল রাজা হিসেবে বিজয় সিংকে সিংহলবাসিগণ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেন। বিজয় সিংহকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে শ্রীলঙ্কাবাসী তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সিংহের প্রতীক শ্রীলঙ্কার জাতীয় পতাকা থেকে সামরিক বাহিনীর প্রতীক সর্বত্র ব্যবহার করে থাকেন অসুরদলনীয় বাহন পশুরাজের চিত্র। বরেণ্য এই বাঙালির স্মৃতির প্রতি জানাই অতল শ্রদ্ধা। •

জ্যোতির্ময় সাহা
প্রাবন্ধিক

Uttarakhand

একনজরে উত্তরাখণ্ড

দেশ	ভারত
অঞ্চল	উত্তর ভারত
রাজধানী	দেরাদুন
জেলা	১৩টি
প্রতিষ্ঠা	৯ নভেম্বর, ২০০০
সরকার	
• রাজ্যপাল	বেবি রানি মৌর্য
• মুখ্যমন্ত্রী	শ্রী পুষ্কর সিং ধামি
• বিধানসভা	এককক্ষ বিশিষ্ট (৭১টি আসন)
• লোকসভা	৫টি আসন
• রাজ্যসভা	৩টি আসন
• হাইকোর্ট	উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট
আয়তন	
• মোট	৫৩,৪৮৩ বর্গকিমি (২০,৬৫০ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	১৯শ
জনসংখ্যা (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)	
• মোট	১,০১,১৬,৭৫২
• ক্রম	২০শ
• ঘনত্ব	১৮৯/বর্গকিমি (৪৯০/বর্গমাইল)
• সাক্ষরতা	৭৯.৬৩%
সময় অঞ্চল	ভারতীয় মান সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও	৩১৬৬ IN-UT
সরকারি ভাষা	হিন্দি ও সংস্কৃত
ওয়েবসাইট	www.uk.gov.in

বেবি রানি মৌর্য
রাজ্যপাল

শ্রী পুষ্কর সিং ধামি
মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রবিন্দু

উত্তরাখণ্ড

রিফাত আরা

উত্তরাখণ্ড রাজ্যকে ডাকা হয় 'দেবভূমি'। সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এই রাজ্যে দেবতারা বসবাস করেন। সেই কারণেই এই রাজ্যকে নিজের হাতে যত্ন নিয়ে সাজিয়েছে প্রকৃতি। পাহাড়ঘেরা এই রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। একদিকে হিমালয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা অন্যদিকে ধর্মীয় তীর্থস্থান। এসব কারণেই উত্তরাখণ্ড হয়ে উঠেছে পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দু

ইতিহাস

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই উত্তরাখণ্ডে মানুষের বসতি থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগে এই অঞ্চল কুরু ও পাঞ্চাল মহাজনপদের অংশ ছিল। মধ্যযুগে এই অঞ্চল কুমায়ূন রাজ্য ও গাড়োয়াল রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ১৮১৬ সালে ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধের পর উত্তরাখণ্ডের অধিকাংশ অঞ্চল ব্রিটিশ ভারতে অঙ্গীভূত হয়। পূর্বতন কুমায়ূন ও গাড়োয়াল রাজ্যদুটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বি হলেও,

ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও প্রথাগত মিলের জন্য দুই অঞ্চলের মধ্যে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল তা ১৯৯০-এর দশকে উত্তরাখণ্ড আন্দোলনকে বিশেষ গতি দিয়েছিল।

উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশ এবং হিমালয় পর্বতমালার একটি অংশের বেশ কয়েকটি জেলা নিয়ে উত্তরাখণ্ড অঞ্চলটি গঠিত। রাজ্যটি হিমালয়ের তরাই ও ভাবর অঞ্চলের নিজস্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদের জন্য বিখ্যাত। রাজ্যের উত্তরে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল তিব্বত অবস্থিত। ২০০০ সালের ৯ নভেম্বর থেকে এটি পৃথক রাজ্য সরকারসহ ভারতের একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে পরিণত হয়। ভারতের বৃহত্তম জনবহুল রাজ্য, উত্তরপ্রদেশকে বিভাজন করে এই রাজ্যটি গঠিত হয়েছে।

২০০৭ সালে এই রাজ্যটির নাম উত্তরাঞ্চল থেকে উত্তরাখণ্ড করা হয়েছে। দেরাদুন, রাজ্যের রাজধানী এবং এটি এই রাজ্যের বৃহত্তম শহর। উত্তরাখণ্ডের প্রধান বিচারালয় রাজ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর নৈনিতালে অবস্থিত। হস্তশিল্প ও তাঁত এই দুই হলো রাজ্যের প্রধান শিল্প। 'চিপকো' আন্দোলনের উৎস হিসেবে এই রাজ্য পরিচিত।

ভূগোল

উত্তরাখণ্ড রাজ্যের আয়তন ৫৩,৪৮৩ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে ৮৬% পার্বত্য অঞ্চল এবং ৬৫% বনাঞ্চল। রাজ্যের উত্তরাংশের অধিকাংশ স্থানই হিমালয়ের শৃঙ্গ ও হিমবাহ দ্বারা আচ্ছাদিত। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে রাস্তা, রেলপথ ও অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার সময় হিমালয়ের অঞ্চলের দুর্গমতা সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করেছিল। হিন্দুধর্মের প্রধান দুই নদী গঙ্গা ও যমুনা এই রাজ্যের যথাক্রমে হিমবাহ গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী থেকে উৎসারিত। সেই সঙ্গে এই রাজ্যের বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ শহরদুটি হিন্দুধর্মের প্রধান তীর্থশহরগুলোর অন্যতম। উত্তরাখণ্ডের জিম করবেট জাতীয় উদ্যান ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম জাতীয় উদ্যান। এখানে বেঙ্গল টাইগার দেখা যায়। এই রাজ্যের গাড়োয়াল অঞ্চলের যোশীমঠের কাছে ভ্যুন্দর গঙ্গার উচ্চ অববাহিকায় ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স একটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান।

জনসংখ্যা

উত্তরাখণ্ডের অধিবাসীদের সাধারণত উত্তরাখণ্ডি বলা হয়। কখনো কখনো তাদের বিশেষভাবে কুমায়ুনি ও গাড়োয়ালি বলা হয়। কুমায়ুন অঞ্চলের অধিবাসীদের কুমায়ুনি ও গাড়োয়াল অঞ্চলের অধিবাসীদের গাড়োয়ালি বলা হয়। উত্তরাখণ্ডের জনসংখ্যা ১০০.৮৬ মিলিয়ন। এর মধ্যে ৫১.৩৮ মিলিয়ন পুরুষ এবং ৪৯.৪৮ মিলিয়ন মহিলা। ৭০.৩৭% অধিবাসী গ্রামের বাসিন্দা। এই রাজ্যের জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৮৯ জন। লিঙ্গানুপাতের হার প্রতি ১০০০ পুরুষে ৮৯০ জন মহিলা। জনসংখ্যার দিক থেকে এটি ভারতের ১৯তম সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য। এই রাজ্যের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ রাজপুত ও ব্রাহ্মণ। রাজ্যের ৮৫% লোক হিন্দু ধর্মাবলম্বী। মুসলমানেরা এই রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী। এছাড়াও শিখ, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও জৈনরাও এই রাজ্যে বাস করেন।

ভাষা

উত্তরাখণ্ডের কুমায়ুন ও গাড়োয়াল অঞ্চলে পাহাড়ি ভাষার দুটি উপভাষা যথাক্রমে গাড়োয়ালি ও কুমায়ুনি। জৌনসারি ও ভোটি ভাষা যথাক্রমে পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর ভাষা। শহরের অধিবাসীরা সাধারণত হিন্দিতে কথা বলেন। হিন্দি উত্তরাখণ্ডের সরকারি ভাষা। উত্তরাখণ্ডই ভারতের একমাত্র রাজ্য যেখানে হিন্দির পাশাপাশি সংস্কৃতও সরকারি ভাষার মর্যাদা পেয়েছে।

প্রশাসন

সংবিধান অনুসারে, দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো উত্তরাখণ্ডেও সংসদীয় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত। উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল রাজ্যের আনুষ্ঠানিক প্রধান। ভারত সরকারের পরামর্শক্রমে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে পাঁচ বছরের মেয়াদে নিযুক্ত করেন। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রকৃতি কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ভোগ করেন। তিনি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী দল বা জোটের প্রধান। উত্তরাখণ্ডের বিধানসভা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। বিধানসভার সদস্যদের বলা হয় বিধায়ক। বিধায়কদের মধ্যে থেকে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। অধ্যক্ষ বিধানসভার পৌরোহিত্য করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ সভায় পৌরোহিত্য করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজ্যপাল ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের নির্বাচিত করেন। উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রিসভা বিধানসভার কাছে নিজেদের কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকে।

উত্তরাখণ্ডের সর্বোচ্চ আদালত উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট নৈনিতাল শহরে অবস্থিত। এই আদালত ছাড়াও রাজ্যে নিম্নস্তরের আদালতও রয়েছে।

অর্থনীতি

ভারতের অধিকাংশ রাজ্যের মতো উত্তরাখণ্ডের অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো কৃষি। বাসমতী চাল, গম, সয়াবিন, চীনাবাদাম, কাঁচা খাদ্যশস্য, ডাল ও তৈলবীজ এই রাজ্যের প্রধান কৃষিজ পণ্য। ফলের মধ্যে আপেল, কমলালেবু, পেয়ারা, পিচ, লিচু ও খেজুর এখানে প্রচুর পরিমাণে ফলে। ফল-প্রক্রিয়াকরণ শিল্পও রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। এই রাজ্যে লিচু, হর্টিকালচার, লতাপাতা, ঔষধি গাছ ও বাসমতী চালের জন্য বিশেষ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হলো পর্যটন ও জলবিদ্যুৎ। এছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তি, আইটিইএস, জৈবপ্রযুক্তি, ফার্মাকিউটিক্যাল ও অটোমোবাইল, পর্যটন, তথ্যপ্রযুক্তি, উচ্চশিক্ষা ও ব্যাংকিং-ই এই রাজ্যের প্রধান শিল্পক্ষেত্র।

যোগাযোগ

উত্তরাখণ্ডে সড়ক, রেল ও আকাশ-তিন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। মূলত সড়কপথই প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা। রাজ্য সড়ক পরিবহন সংস্থা 'উত্তরাখণ্ড পরিবহন সংস্থা' নামে পরিচিত। এটিই রাজ্যের প্রধান পরিবহন সংস্থা।

রাজ্যের দেরাদুনের জলি গ্র্যান্ট বিমানবন্দর রাজ্যের ব্যস্ততম বিমানবন্দর। এছাড়াও পন্তনগর বিমানবন্দর, নৈনি সাইনি বিমানবন্দর, ভারকোট বিমানবন্দর এবং গৌচর বিমানবন্দর থেকে বিমান যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

উত্তরাখণ্ড ভূখণ্ডের ৮০%-এরও বেশি অঞ্চল পর্বতাকীর্ণ। তাই এই রাজ্যে রেল পরিষেবার পরিধি সীমাবদ্ধ। মূলত সমতল অঞ্চলেই রেল পরিষেবা চালু আছে।

শিক্ষা

উত্তরাখণ্ডের সাক্ষরতার হার ৭৯.৩৩%। পুরুষ সাক্ষরতার হার ৮৮.৩৩% এবং নারী সাক্ষরতার হার ৭০.৭০%। রাজ্যের বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাদানের মাধ্যম ইংরেজি বা হিন্দি ভাষা। রাজ্যে প্রধানত সরকারি, সরকার-কর্তৃক সাহায্য না পাওয়া বেসরকারি এবং সাধারণ বেসরকারি বিদ্যালয় রয়েছে। বিদ্যালয়গুলো সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই), কাউন্সিল ফর ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনস (সিআইএসসিই) ও উত্তরপ্রদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠক্রম অনুসারে চলে।

ক্রীড়া

অ্যাডভেঞ্চার খেলাধুলা, জলক্রীড়া ও পর্বতারোহণ উত্তরাখণ্ডে খুবই জনপ্রিয়। পর্যটক ও অ্যাডভেঞ্চার-অনুসন্ধানীরা উত্তরাখণ্ডে হোয়াইটওয়াটার রিভার রাফটিংয়ের জন্য আসেন। উত্তরাখণ্ডে অনেক সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ থাকায় এটি পর্বতারোহীদেরও একটি প্রিয় গন্তব্য। উত্তরাখণ্ডের খরস্রোতা পার্বত্য নদ-নদীগুলো অ্যাডভেঞ্চার-অনুসন্ধানীদের কাছে সেইলিং ও প্যারাসেইলিং উপভোগের বিশেষ সুবিধে করে দেয়। উত্তরাখণ্ডের রানিখেত ইত্যাদি অঞ্চলে গলফ একটি নতুন পর্যটন আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এখানে প্রচুর গলফার আসেন।

সংস্কৃতি

উত্তরাখণ্ডের জাতিগত বৈচিত্র্যের কারণে এই রাজ্যে হিন্দি, কুমায়ুনি, গাড়োয়ালি, জৌনসারি ও ভোটি ভাষায় সমৃদ্ধ সাহিত্যিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। এই রাজ্যের বিভিন্ন কিংবদন্তির উৎস এই রাজ্যের চারণকবিদের কাব্যগীতি। এগুলিকে এখন হিন্দু সাহিত্যের ধ্রুপদি রচনা গণ্য করা হয়। গঙ্গাপ্রসাদ বিমল, মনোহর শ্যাম যোশী, প্রসূন যোশী, শেখর যোশী, শৈলেশ মাতিয়ানি, শিবানী, মোহন উপ্রেতি, বি. এম. শাহ, মঙ্গলেশ দাবরাল, সুমিত্রানন্দন পন্ত প্রমুখ এই রাজ্যের প্রধান সাহিত্যিক।

উত্তরাখণ্ডের সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো সংগীত। মঙ্গল, বাসন্তী, খুদেদ ও ছোপাটি এখানকার জনপ্রিয় লোকসংগীত। এই রাজ্যের জনপ্রিয় লোকসংগীতশিল্পীরা হলেন নরেন্দ্র সিং নেগি ও মিনা রাণা।

উত্তরাখণ্ড ভূখণ্ডের নৃত্যকলা এই অঞ্চলের জীবন ও মানব অস্তিত্বের বিভিন্ন আবেগের সঙ্গে যুক্ত। পুরুষদের লংবীর নৃত্য অনেকটি জিমন্যাস্টিক ভঙ্গিমাগুলোর অনুরূপ। দেরাদুনের আরেকটি বিখ্যাত লোকনৃত্য হলো বরদা নটী নৃত্য। এটি বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের সময় আয়োজিত হয়। অন্যান্য বিখ্যাত নৃত্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হুরকা বাউল, ঝোরা-চাঁচরি, ঝুমাইলা, চুপহুলা ও ছোলিয়া।

উত্তরাখণ্ডের স্থানীয় শিল্পকলার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো কাঠখোদাই শিল্প। রাজ্যের বিভিন্ন মন্দির অলংকরণের কাজে এই শিল্প ব্যবহৃত হয়। কাঠের ওপর ফুল, দেবদেবী ও জ্যামিতিক নকশা আঁকা হয়। গ্রামের ঘরবাড়িতে দরজা, জানলা, সিলিং ও দেয়াল চিত্রণেও এই শিল্প ব্যবহার করা হয়। বাড়ি ও মন্দিরে সুন্দর ছবি ও ম্যুরাল ব্যবহৃত হয়। উত্তরাখণ্ডের অন্যান্য শিল্পের মধ্যে সোনার গয়না, গাড়োয়ালের ঝুড়ি শিল্প, উলের শাল, স্কার্ফ ও গালিচাশিল্প বিখ্যাত।

খাদ্য

রুটি ও সবজি উত্তরাখণ্ডের মানুষের প্রধান খাদ্য। তবে আমিষ খাবারও চলে। উত্তরাখণ্ডের মানুষদের খাদ্যাভ্যাসের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো টম্যাটো, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের বহুল ব্যবহার। বাজরা (স্থানীয় নাম 'মাদুয়া' বা 'ঝিঙ্গোরা') এই অঞ্চলের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য। বল মিঠাই এখানকার এক জনপ্রিয় মিষ্টি। অন্যান্য জনপ্রিয় খাবার হলো দুবুক, চেইন, কাপ, চুটকানি, সেই ও গুলগুলা। 'ঝোই' বা 'ঝোলি' নামে কাধির একটি আঞ্চলিক রূপান্তরও এখানে জনপ্রিয়।

উৎসব

হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান মেলা কুম্ভমেলা উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত হয়। ভারতের যে চারটি তীর্থে এই মেলা হয় এই রাজ্যের হরিদ্বার তার অন্যতম। গঙ্গা দশহরা, বসন্তপঞ্চমী, মকর সংক্রান্তি, ঘি সংক্রান্তি, খাতারুয়া, সাবিত্রী ব্রত ও ফুল দেই এই রাজ্যের অন্যতম প্রধান উৎসব। কানোয়ার যাত্রা, কাণ্ডালি উৎসব, রাম্মান, হারেলা মেলা, কৌচণ্ডী মেলা, উত্তরায়ণী মেলা ও নন্দা দেবী রাজ জাট মেলা এই রাজ্যের প্রধান মেলা।

পর্যটন

পর্যটনের স্বর্গরাজ্য উত্তরাখণ্ড। দেশি বিদেশি পর্যটকে সবসময় ভর্তি থাকে উত্তর ভারতের এই অপূর্ব সুন্দর রাজ্যটি। অনেকেই দিল্লি ভ্রমণ করে উত্তরাখণ্ডের উদ্দেশে রওনা দেন। কেউ আবার উত্তরপ্রদেশ হয়ে চলে যান উত্তরাখণ্ডে। অভয়ারণ্য, গঙ্গা নদী, পাহাড়, জঙ্গল সব মিলিয়ে উত্তরাখণ্ড যেন এক রূপকথার রাজ্য।

জিম করবেট জাতীয় উদ্যান

দেশের সবচেয়ে প্রাচীন অভয়ারণ্য উত্তরাখণ্ডের জিম করবেট জাতীয় উদ্যান। এটি অভয়ারণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৬ সালে। অভয়ারণ্যে প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিপন্ন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা। প্রথমে ব্যাঘ্র প্রকল্প হিসেবে শুরু হলেও পরে উত্তরাখণ্ডের নৈনিতাল এবং পৌড়ি গাড়োয়ালে অবস্থিত এই জাতীয় উদ্যানে পরিণত হয়। নামকরণ হয় বিখ্যাত শিকারি এবং প্রকৃতিপ্রেমী জেমস্ এডওয়ার্ড করবেটের নামে। এখানে প্রায় ৫০০ প্রজাতির গাছপালা এবং প্রাণী আছে। প্রায় ৫২০.৮ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে থাকা এই জাতীয় উদ্যানে রয়েছে পাহাড়, নদী, জলাভূমি, তৃণভূমি এবং একটি বিশাল হ্রদ। সমুদ্রতল থেকে এখানকার গড় উচ্চতা ১,৩০০ থেকে ৪,০০০। এখানকার অন্যতম আকর্ষণ সাদা কুমীর। এছাড়াও বাঘ, হাতি ইত্যাদির দেখা মেলে।

হৃষিকেশ

হৃষিকেশ নাম শুনলেই মনে হয় বয়স্ক মানুষদের তীর্থক্ষেত্রে। হৃষিকেশকে বলা হয় যোগের রাজধানী। বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ এখানে আসেন যোগ এবং ধ্যান করার উদ্দেশে। এখানে রিভার রাফটিং বা বোনফায়ারের আনন্দেরও কোনো তুলনা হয় না। চাইলে তাঁবুতেও থাকতে পারেন। রিভার রাফটিং ছাড়াও ক্যাম্পেইনিং, বাঞ্জি জাম্পিংসহ একাধিক অ্যাডভেঞ্চার গেম রয়েছে হৃষিকেশে। এছাড়াও গঙ্গা নদীর ঊর্ধ্ব গতির খরস্রোত দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

চোপতা

বিশ্বের উচ্চতম শিব মন্দির টুঙ্গনাথ রয়েছে এই চোপতাতে। তীর্থক্ষেত্র হলেও হিমালয় পাহাড়ের কোলে অবস্থিত চোপতা অসম্ভব শান্ত একটি গ্রাম। পাহাড়ে ঘেরা গ্রামটির চারদিক সবুজে সবুজ। নিরিবিলি যাঁরা পছন্দ করেন তাঁদের জন্য আদর্শ স্থান এটি। পায়ে হেঁটে এলাকা ঘুরতে দারুণ মজা লাগে। শীতকালে এখানে বরফ পড়ে। সব মিলিয়ে অবসর যাপনের একটি আদর্শ স্থান এটি।

আউলি

শীতকালের সেরা পর্যটন ক্ষেত্র হতে পারে আউলি। শীতে আউলি বরফের চাদরে ঢাকা থাকে। আউলি থেকে মানা পর্বত, মাউন্ট নন্দাদেবী এবং নর পর্বতের ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। আউলিতে আছে মিষ্টি জলের একটি গভীর হ্রদ। নাম ছত্রকুণ্ড। আর আছে ট্রেকিং করার সেরা জায়গা কুমারী পাস। শীতে চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। তবে শুধু শীতেই নয় গরমকালেও আউলি ঘোরা যায়। এখানে গেলে জ্যোতির্মঠ, নন্দাদেবী জাতীয় উদ্যান দেখতে পারা যায়।

মুসৌরি

মুসৌরি এক সুন্দরী নগরী। শীতে তার রূপ যেন আরও খোলাসা হয়ে যায়। প্রধানত গরম এবং শীতকালেই এখানেই পর্যটকরা ভিড় জমান। যাঁরা গরমে দু-দণ্ড শান্তি চান তাঁরা গ্রীষ্মকালে এখানে যেতে পারেন। আর যাঁরা অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসেন তাঁরা যেতে পারেন শীতকালে। বেড়াতে যেতে পারেন নহাতা এস্টেট, গানহিল, কেম্পটি জলপ্রপাত মিষ্টি হ্রদ, মুসৌরি হ্রদ, ভট্ট জলপ্রপাত, ঝরিপানি জলপ্রপাত, নাগ দেবতার মন্দির, জ্বালাদেবী মন্দির কিংবা বেনোগ অভয়ারণ্যে।

হরিদ্বার

ভারতের সকল ভ্রমণ স্থলগুলোর মধ্যে হরিদ্বার অন্যতম একটি আকর্ষণীয় স্থান। এখানকার প্রাকৃতিক পটভূমি ও মনোরম দৃশ্য আমাদের হৃদয়ে পরম আনন্দের সঞ্চার করে। এখানে প্রবাহিত গঙ্গা সকলের মনপ্রাণ প্রসন্ন করে। গঙ্গার নির্মল পবিত্র রূপ ও ধারা যেন জায়গাটিকে বিশ্বের প্রথম সারির ভ্রমণস্থলে পরিণত করেছে। ঋষি, মুনি, সিদ্ধ পুরুষদের আনাগোনায় এই তপস্যাভূমি সবসময় সরগরম থাকে। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণেই নয়, হরিদ্বারে একটি ধর্মীয় পটভূমিও রয়েছে।

বদ্রীনাথ

হিন্দু ধর্মের অন্যতম বিখ্যাত তীর্থস্থান হলো বদ্রীনাথ মন্দির। হিমালয়ের গাড়ওয়াল অঞ্চলে অবস্থিত এই মন্দির চার ধাম যাত্রার অন্যতম ধাম। শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই মন্দিরটির কথা বহু প্রাচীন শাস্ত্রে ও পুরাণে উল্লেখ রয়েছে। এই মন্দিরের সঙ্গ জড়িয়ে আছে নানা আকর্ষণীয় গল্প ও ধর্মীয় বিবরণ। বদ্রীনাথ মন্দিরটি শহরের প্রধান আকর্ষণ। কিংবদন্তি অনুসারে, আদি শঙ্করাচার্য অলকানন্দা নদীতে শালিগ্রাম পাথর দিয়ে তৈরি ভগবান বদ্রিনারায়ণের কালো পাথরের মূর্তি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি মূলত তাপ কুণ্ড উষ্ণ প্রস্রবণের কাছে গুহায় এটি স্থাপন করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে, গাড়োয়ালের রাজা মূর্তিটিকে বর্তমান মন্দিরে স্থানান্তরিত করেন। মন্দিরটি প্রায় ৫০ ফুট (১৫ মিটার) লম্বা যার উপরে ছোট কপোলা, সোনার গিল্টের ছাদ দিয়ে আবৃত। সম্মুখভাগটি খিলানযুক্ত জানালাসহ পাথরের তৈরি। প্রশস্ত সিঁড়ি লম্বা খিলানযুক্ত গেটওয়ে পর্যন্ত নিয়ে যায়, যা মূল প্রবেশদ্বার।

পদ্মপুরাণে বদ্রীনাথের আশপাশের এলাকাকে আধ্যাত্মিক ভান্ডারে সমৃদ্ধ বলে পালিত করা হয়েছে। এই স্থানটি জৈন ধর্মেও পবিত্র বলে বিবেচিত হয়।

কেদারনাথ

কেদারনাথ হিন্দুদের আরেকটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এটি হিমালয় পর্বতমালায় ৩,৫৮৪ মিটার উচ্চতায় মন্দাকিনী নদীর তীরে অবস্থায়। শহরটিকে ঘিরে থাকে হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গ। কেদারনাথ শহরে অবস্থিত কেদারনাথ মন্দির হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। এই মন্দিরটি ছোট চার ধাম তীর্থ-চতুষ্টয়ের অন্যতম। পৌরাণিক রাজা কেদারের নামে কেদারনাথ শহরটি নামাঙ্কিত। কথিত আছে, তিনি সত্য যুগের রাজা ছিলেন। তাঁর রাজ্যের নাম ছিল কেদারখণ্ড। মহাভারতেও কেদারনাথের উল্লেখ আছে। পাণ্ডবরা এখানে শিবের তপস্যা করেছিলেন।

এছাড়াও দেরাদুন, নৈনিতাল, রানিখেত, উত্তরাখণ্ডের জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী দর্শনীয় স্থান।

রিফাত আরা
শিক্ষার্থী

সূত্র : উত্তরাখণ্ড সরকারি পোর্টাল, উইকিপিডিয়া ও বিভিন্ন অনলাইন সাইট। •

আপনার মতামত জানান

যোগাযোগের ঠিকানা ও ই-মেল

ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯

এক্সটেনশন : ১১৪২

inf2.dhaka@mea.gov.in

ভারত বিচিত্রায় ব্যবহৃত বেশকিছু ছবি ও অলংকরণ ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভারত বিচিত্রা বিক্রয়ের জন্য নয়

১. দুর্গাপট ২. করোনা ভাইরাস পট ৩. গরুর পট

বীরভূমের পটশিল্প ও পটসংগীত

সেখ একরামুল হোসেন

লোকশিল্প

রাঢ়বঙ্গের অন্যতম সমৃদ্ধ জেলা বীরভূম। রাঙামাটির দেশ তথা বীরভূমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য মঠ, আশ্রম, মন্দির-মসজিদ ও ঋষিদের সাধনক্ষেত্র। রয়েছে শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাবধন্য বীরচন্দ্রপুরের একচক্রা গ্রাম, তারাপীঠে তারা মা, সাঁইথিয়ায় দেবী নন্দিকেশ্বরী, লাভপুরে দেবী ফুল্লরা, চন্ডীদাস-রজকিনীর প্রেমলীলার সাধনক্ষেত্র নানুর, দুবরাজপুরের পাহাড়েশ্বর শিব ও মামা-ভাগ্নে পাহাড়, জয়দেব-কেঁন্দুলিতে দ্বাদশ শতাব্দীর কবি জয়দেবের সাধনক্ষেত্র, নলহাটিতে নলাটেশ্বরী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রাঙামাটির দেশে গড়ে তুলেছেন প্রাণের শান্তিনিকেতন, একটা সময় মহাবীরের পদধূলিতে ধন্য হয়েছে বীর জাতির সাধনভূমি বীরভূম। তবে বীরভূমের কঙ্করময় লালমাটিতে মিশে আছে লোকসংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান

এখানকার ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশে রয়েছে এক আত্মিক যোগসূত্র। বীরভূমে লোকায়ত সমাজে বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীত মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আসছে। সেইসব লোকসংগীত হলো ভাদুগান, বোলান গান, মনসামঙ্গলের গান, কৃষ্ণযাত্রার গান, হাবু গান, বাউল গান, কবিগান, প্রভাতী সংগীত বা টহল গান ও পটের গান। আমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু বীরভূমের পটশিল্প ও পটসংগীত। পট ও পটুয়ার আবির্ভাব আজকের কথা নয়, তবে মানবসভ্যতার কোন স্তরে ঘটেছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। ধর্মপ্রচার এবং লোকশিক্ষার এই বাহনটির আবির্ভাব মূলত সমাজের তাগিদেই। ভারতবর্ষের সর্বত্রই এই পটুয়াদের অস্তিত্ব বিরাজমান এই পটুয়ারা কোথাও 'পোটো' আবার কোথাও 'পটচিত্রকর' নামেও সমধিক পরিচিত। 'পটুয়া' শব্দটি এসেছে মূলত 'পট্টিকার>পটকার>পটুয়া' এভাবে। আর 'পট' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'পট্ট' শব্দ থেকে। যার অর্থ কাপড় বা বস্ত্র। লেখা বা ছবি আঁকার কাজে ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ডকে পট বলা হয়। পটশিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল বহু প্রাচীনকালেই। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পুরাণ, জীবনীকাব্য এমনকি মঙ্গলকাব্যেও এর সন্ধান মেলে। এছাড়াও পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'কংসবধ' পালায় এবং পাণিনির 'অষ্ট্যাধয়ী'তেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকে, বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে

পটুয়াদের জনপ্রিয়তা ও গুপ্তচরবৃত্তির কথা জানতে পারা যায়। পটুয়া বা চিত্রকরবৃত্তি ছিল এক প্রাচীন বৃত্তি। পুরাকালে শাস্ত্রের বিধান মেনে শুভ্র বা পট্টবস্ত্র বা কাপড়ের ওপর পটুয়ারা ছবি আঁকতেন। মূলত সমাজের নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়গণ এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বীরভূমের পটশিল্পের নানান ধরনের বিভাগ ও ধরন লক্ষিত হয়। আকৃতি ও বিষয়শৈলী অনুসারে পটের বিভিন্নতা দেখা যায়। আকৃতি অনুসারে পট মূলত দুই প্রকার। যথা : জড়ানো পট বা দিঘল পট এবং চৌকো পট। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানতে পারি, জড়ানো বা দিঘল পটগুলো লম্বায় ১৫০-২০০ সে.মি. এবং প্রস্থে ২৫-৩০ সে.মি. হয়ে থাকে। চৌকোপট বর্গাকার বা আয়তকারের হয়ে থাকে। অন্যদিকে বিষয়শৈলি অনুসারে পট চার প্রকার। যথা–

১. যমপট : এই পটের মাধ্যমে বীরভূমের পট সংগীতকারেরা পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, স্বর্গ-নরক প্রভৃতি বিষয় চিত্রের আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়।
২. গাজিপট : মুসলিম ধর্মের বীর যোদ্ধা ও গাজি বা সুফী সাধকদের বীরত্ব ও তাঁদের অলৌকিক মহিমাকে চিত্রের আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়।
৩. অবতার পট : বিভিন্ন পৌরাণিক বিষয়কে অবলম্বন করে এই পট প্রদর্শিত হয়। এই পটে উঠে আসে রামায়ণ, মহাভারত ও মঙ্গলকাব্যের বিষয়গুলো চিত্রের আকারে উঠে আসে।
৪. আদিবাসী পট : সাঁওতাল-আদিবাসীদের জন্মবৃত্তান্ত, তাদের জীবনযাত্রা ইত্যাদি বিষয়গুলো উঠে আসে।
৫. গরুর পট : সনাতন ধর্ম বা হিন্দু সমাজে গরুকে দেবতা রূপে মান্য করা হয় ও তার পূজা করা হয়। এই বিষয়কে অবলম্বন করে গো রক্ষণাবেক্ষণ ও তার প্রতিপালনকে উপজীব্য করে গরুর পট রচিত হয়ে থাকে।
৬. সমসাময়িক বিষয়সংক্রান্ত পট : বর্তমান সময় ও পরিস্থিতির সাপেক্ষে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দিকগুলো তুলে ধরা হয়। এই পটগুলোতে বীরভূমের পটুয়ারা ঘরজামাই থাকার বিড়ম্বনা, সমাজে নানান ধরনের কষ্ট-যন্ত্রণার কথা, মা-বাবাদের মানসিক দুঃখ, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, বেকার সমস্যা, বিভিন্ন মহামারি, বন্যা ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে পরিবেশিত করেন। তবে পটসংগীত শুরু করার পূর্বে দর্শকদের সামনে হাজির করতে পটের শুরুতে 'টেলার পট' (ছেলে ভোলানো নানান ধরনের মজাদার চিত্র) দেখিয়ে থাকেন।

গবেষক ও পটসংগীতকার

পট প্রস্তুত পদ্ধতি

উপকরণ : আর্ট পেপার, রং, তুলি, সুতির কাপড়, আঠা, তুঁতে, এলামাটি, গোবর ইত্যাদি।

প্রস্তুতপ্রণালি : প্রথমে সাদা আর্ট পেপারে রং ও তুলি দিয়ে বিভিন্ন চিত্র এঁকে থাকেন। বিভিন্ন রঙের ব্যবহার ও উৎপাদন লোকজ রীতিতে হয়ে থাকে। রঙের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহৃত হয়। যেমন–

হলুদ রং : হলুদ গুঁড়ো, এলামাটি গুঁড়ো করে বেলের আঠা মিশিয়ে এই রং প্রস্তুত করা হয়। তাতে জল মিশ্রিত করে আঁকার উপযোগী করা হয়।

কালো রং : ধানসেদ্ধ হাঁড়ির ভুসাকালি ও মুড়ি ভাজা খোলার ভুসাকালির সঙ্গে বেলের আঠা মিশ্রিত করে এবং তার সঙ্গে এঁটেল মাটি পুড়িয়ে গুঁড়ো করে বেলের আঠার মিশ্রণ দিয়ে এই রং প্রস্তুত করা হয়।

বেগুনি রং : পুঁইশাকের পাকাফলের রসের সঙ্গে বেলের আঠা মিশ্রিত করে এই রং তৈরি করা হয়।

লাল রং : চুন, খয়ের, সুপারি গুঁড়ো, তেঁতুলের কাঁই, গিরিমাটি প্রভৃতির সঙ্গে বেলের আঠা মিশ্রণ করে এই রং তৈরি হয়।

নীল রং : জামের রস, অপরাজিতা ফুলের রস ও তার সঙ্গে বেলের আঠা মিশিয়ে এই রং প্রস্তুত করা হয়।

গেরুয়া রং : চুনের সঙ্গে কাঁচা হলুদ ও বেলের আঠা মিশ্রিত করে এই রং প্রস্তুত করা হয়।

এলামাটি : উনুনের পোড়ামাটির সঙ্গে জল মিশ্রিত করে ছেঁকে নেওয়া হয়। তারপর রোদে শুকিয়ে বেলের আঠার মিশ্রণ দিয়ে এই রং প্রস্তুত করা হয়।

গাঢ় সবুজ রং : শিম পাতার রসের সঙ্গে বেলের আঠার মিশ্রণ দিয়ে এই রং তৈরি করা হয়।

এই ধরনের প্রাকৃতিক উপাদানজাত রংকে পটুয়ারা 'গাছ গাছড়া' রং নামে আখ্যায়িত করেন। এই রং মূলত পটশিল্পে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক যুগের পটশিল্পকে প্রসারিত করতে ও অঙ্কন শৈলিকে ফুটিয়ে তুলতে 'ফেব্রিক রং' ও 'তেলরং' ব্যবহার করা হচ্ছে। এই রংগুলোর স্থায়িত্ব অনেক বেশি ও বেচা-কেনার চাহিদাও চোখে পড়ার মতো।

পেনসিল বা স্কেচে চিত্র আঁকার পর তা রং দিয়ে ভরাট করা হয়। এক্ষেত্রে বেল বা ময়দার আঠা তুঁতে মিশ্রিত করে প্রলেপ দেওয়া হয়, তাতে কাপড় বসানো হয়। এরপর সেগুলো রৌদ্রে শুকানো হয়। দুই প্রান্তে দুটি বাঁশ বা কাঠের গোলাকার দণ্ড প্রবেশ করিয়ে রোল করে রাখা হয়। কিছুক্ষেত্রে কাপড়ের ওপর এলামাটি বা গোবরের প্রলেপ লাগিয়ে তার ওপর পটচিত্রগুলো আঁকা হয়। সেগুলো পরে দীর্ঘস্থায়িত্ব দান করা হয়।

এই গেল মোটামুটি পট নির্মাণকাহিনি। এইভাবে এত কষ্ট করে পট অঙ্কনের মধ্য দিয়ে বাংলার লোককাহিনির ধারাকে বজায় রেখে নিজস্ব ভঙ্গিতে পটসংগীত পরিবেশিত করে থাকে। বজায় রাখেন সামাজিক সংস্কারের মূল স্রোতকে। এত কষ্টের মধ্যেও তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটেনি, দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। সেই জন্য অনেক পটশিল্পীর সন্তানেরা বংশগত পেশাকে উপেক্ষা করে অন্য ধরনের পেশার পথ বেছে নিয়েছেন। তবে এই ধারাটি বাংলার লোকসংস্কৃতিতে দীপ্তমান। মূলত এই পটশিল্পীদের জীবনবোধ আমাদের আকর্ষিত করে–

> 'সাধারণভাবে পটুয়ারা হিন্দু-মুসলমান উভয় প্রকার ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক আচার-আচরণ পালন করে।'[১]

পটশিল্পীদের অধিকাংশই মুসলিম সম্প্রদায়ের এবং খুব কম সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের। পটুয়াদের মধ্যে যারা মুসলিম সম্প্রদায়ের তারা নামাজ পড়ে ও রোজা রাখে। যারা হিন্দু সম্প্রদায়ের তারা তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে।

> 'পটুয়াদের ধর্মীয় অবস্থানটিকে সুস্পষ্ট করতে গিয়ে বিনয় ঘোষ বলেছেন এরা মুসলমান রীতি পালন করে, কিন্তু এরা মুসলমান নয়। আবার বিনয় ভট্টাচার্য, দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা বীরভূম অঞ্চলের পটুয়াদের ওপর সমীক্ষা করে এদের হিন্দু বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে পটুয়াদের 'রিলিজিয়াস আইডেনটিটি ক্রাইসিস' বিগত কয়েকশো বছর ধরেই। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে বসবাসকারী পটুয়ারা হিন্দু রীতিনীতি-আচার অনুষ্ঠান মেনে চলতে শুরু করেছে, মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে বসবাসকারী পটুয়ারা ইসলামধর্মের আচার-আচরণ পালন করার চেষ্টা করেছে। কেউবা নিজেদের একেবারে হিন্দু অথবা মুসলিম বলে দাবি করতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে পটুয়াদের 'রিলিজিয়াস আইডেনটিটি' পাওয়ার সক্রিয় প্রচেষ্টা বারে বারে লক্ষ করা যায়।'[২]

এ প্রসঙ্গে ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের মতটি প্রণিধানযোগ্য–

> 'পটুয়া সম্প্রদায়টি হিন্দু-মুসলমান মিশ্র সংস্কৃতির বাহন হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করেছে। কেউ আবার বলে থাকেন বল্লাল সেনই চিত্রকরদের মুসলমান বানিয়েছেন। জন্মের ইতিহাস যেমনই হোক, পটুয়ারা যে লোক-শিক্ষক-শিল্পী এবং গায়ক তাতে কোনো সংশয় নেই।'[৩]

পটুয়ারা পটচিত্রগুলো প্রস্তুতের পর সুরসহ গেয়ে থাকেন। পটুয়াদের প্রচলিত কাহিনিগুলোকে ফুটিয়ে তোলার দিকেই মূলত তাদের ঝোঁক ছিল। পটসংগীতে যে গল্পগুলো উদ্ভাসিত হয় তা অদ্ভুত গোত্রের। এই গল্পগুলো পত্রপল্লবে বিকশিত হয়ে অতীত বাংলার হারানো স্মৃতিকে পুনর্জীবিত করে। তাই তারা শুধু সংগীত স্রষ্টাই নয়, একইসঙ্গে গায়ক ও সুরকার। এই সংগীত মূলত আখ্যানমূলক গীতি। পটসংগীত সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে গুরুসদয় দত্ত বলেছেন–

> 'বাংলার অধ্যাত্মজীবনে সর্বাপেক্ষা গভীর স্তরের ভাবধারা ও

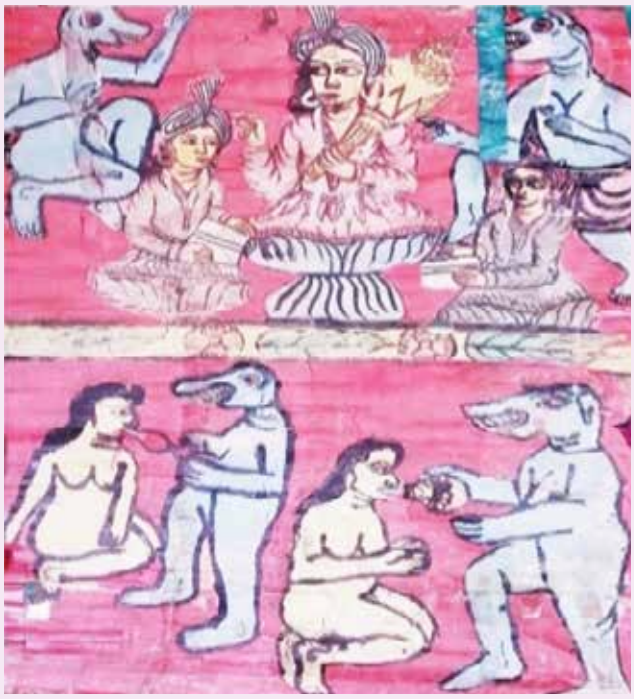

যম পট

> রসধারা এই পটগীতিতে রূপায়ণ লাভ করেছে... সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় ও ছন্দে। ইহা কোনো অভিজাত সমাজের ভাব বিলাসব্যঞ্জক সাহিত্য নয়, জাতির সাধারণ প্রাণ যে অনাবিল ও বিলাস কলুসহীন ভাবধারার জীবন্ত প্রবাহে ভরপুর ছিল, তাহার এবং বাঙ্গালী হিন্দুর গভীর অন্তশ্চরিত্রের ও ধর্ম বিশ্বাসের রসপূর্ণ অথচ সহজ স্বাভাবিক ও সরলতা মাখা রূপায়ণ।'[৪]

আগেকার দিনে মূলত দেবদেবীকে ঘিরেই পটসংগীতগুলো রচিত হতো কিন্তু বর্তমান বা সমসাময়িক সময়ে মানুষজনের রুচির পরিবর্তন ঘটেছে, সেই কারণে এখনো সমসাময়িক আমলে ঘটা বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হওয়া পটচিত্রের দিকে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত বীরভূম জেলার কিছু পটসংগীত তুলে ধরছি

গরুর পট

আরে গরু নারে গরু চারো গরু বড় ধন/আবার যারে ঘরে গরু নাই মা, ওগো মা বৃথা এ জীবন।/ আর শনি মঙ্গল বারে দিনে যে জন ওগো মা গোবর ও বিলায়/ আবার তাহার ঘরে লক্ষ্মী ছেড়ে, ওগো মা অন্য ঘরে যায়।/ আর শনি মঙ্গল বারে দিনে যে জন ওগো মা মাছ পোড়া খায়/বছরে বছরে গোরুর পাল নষ্ট হয়।/আর শনি মঙ্গল বারে দিনে যে জন ওগো মা হলুদ ও বিলায়/অপরের বিপদে সে মা নিজের বিপদ হয়।/আর সকালে উঠিয়া যে জন গোলকারিতে যায়/আবার গঙ্গা স্নানের ফল মাগো বাড়িতে বসে পায়।/আর বড় বউটি বলে মা গো জ্বালার উপর জ্বালা/আর ভেবে চিন্তে দেখো মাগো, ওগো মা সেজ বউয়ের পালা।/আর একটি বউ ছিল মা কপাটেরই আড়ে/ গোলকারিবার নাম শুনে লাফ দিয়ে পড়ল এই দেখ বড় ভাসুরের ঘাড়ে।/আর সুবুদ্ধির বিটিকে মাগো কুবুদ্ধি ধরিল/আর ধরিয়া ঝাঁটার বাড়ি ওগো মা গাভিকে মারিল।/আর ভালোই হল শ্বশুরবাড়ির পাল ঘুচে গেল/আর চালের বাতা ধরে ছোট বউ নাচিতে লাগিল।/আর চলো চলো চলো গাভী ঘুরে ঘরে চলো/তোমারেও সাক্ষেতে বউকে নরবলি দোবো।/আর হারগোর নিয়ে বউয়ের ধূপ ধুমো দিলো /বছরে বছরে পাল বাড়িতে লাগিল॥[৫]

গরুর পট

গো-মাহাত্ম্য পটুয়া গানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। গো-মাহাত্ম্য পটুয়া গানের বিষয় একান্তভাবেই লৌকিক। মুসলমান ফকিরেরা এই গান গেয়ে থাকেন। সেই জন্য এই গান মূলত 'গাজীর গান' নামেও পরিচিত। গৃহস্থ ব্যক্তিবর্গদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের বিধি, নিয়ম ও পালন এবং অর্থনৈতিক ও খাদ্যের চাহিদা মেটাতে গরু পালন অন্যতম পেশা ছিল। তাই সেই গরুর যথাযথ প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত যা একান্নবর্তী পরিবারের সমস্ত বউরা সম্পাদন করেন। সেই নির্দেশ শ্বশুরমশাই বা বাড়ির কর্তারা দিতেন। আর এই কাজ যথার্থ সম্পাদিত না হলে যে কি ভয়ংকর পরিণতি নেমে আসতে পারে সেই বিপদসূচক দিকগুলো এই পটসংগীতে উদ্ভাসিত হতে শোনা যায়। অনুরূপভাবেই এই গানে বাংলা ও বাঙালির লোকসংস্কার প্রতিফলিত হয়েছে।

যমপট

রবি পুত্র যমরাজ সোম নাম ধরে/ বিনা অপরাধে কারো দণ্ড নাহি করে।/ যে জন সদা করে নাই নাই/ সদা মিথ্যা কথা কয়।/ ননী ওগো মা চুরি করে খাই/ আর মস্ত সাঁড়াশি করে জিহ্বা টেনে লেয়।/ আর ভাঙারির চাল যে জন ভুল করে খায়/ মস্তকেতে নিয়ে যেয়ে ঢেকিতে পার দেয়।/ নিজের পতি থাকতে যে জন পরের কাছে যায়/ তাকে খরখড়ে খেজুর গাছে তুলে, তাহার ওগো মা অতি সাজা দেয়।/আর হীরামণি বেশ্যা মাগো, অন্নদান-বস্ত্রদান সোনা দান করেছিল/ তাই তাকে সোনার পুস্পরথে স্বর্গে নিয়ে গেল।/ তাই, এক কটি চাল দেবেন মা, এক খোড়া মুড়ি/খেয়ে দেয়ে নাম করব বীরভূমের দাঁড়কা আমার বাড়ি॥[৬]

যমপট

উক্ত গানটি যমপটের। এই গানে মানুষের অপকর্মের ফল ধরা পড়ে। উক্ত সংগীতটিতে আমরা দেখি, চুরি করে খাওয়ার অপরাধে যমদূত মস্ত সাঁড়াশি নিয়ে জিহ্বা কেটে বা টেনে নেয়। তাছাড়াও নিজের পতি বা স্বামী থাকতেও পরপুরুষে আসক্ত হয় ও গমন করে তাদের শাস্তিস্বরূপ ধারালো খেজুর গাছে তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও দেখি অসৎ কর্মের পরিবর্তে যদি ভালো কাজ করা যায় তাহলে তার পরিণতি শুভ বা মঙ্গলময় হয়। যেমন–হীরামণি একজন বেশ্যা হলেও তিনি প্রচুর দান-ধ্যান করেছিলেন তাই তাকে যমদূতেরা পুস্পরথে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিল। এই পটসংগীতের ভণিতা অংশে পটুয়ার বাড়ি ও গ্রামের কথা জানা যায়।

দুর্গাপট

উমা বা দুর্গা কৈলাশ থেকে বাপের বাড়ি আসেন এক বছর পর। তাঁকে ঘিরে আপামর বাঙালি জনমানসে ছড়িয়ে পড়ে আনন্দের বা উচ্ছ্বাসের ঢেউ। মা দুর্গা তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন বলে লোকমানসে বিশ্বাস আর তাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে এই পটসংগীত। ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত এই বিষয়ের একটি পটসংগীত তুলে ধরছি :

নম নারায়ণী, আর বছর পরে আসে দুর্গা বিপদের তারিণী/ দিন যায় গো দিন আমার করে ভিক্ষা তাই।/ যেদিন ভিক্ষা পায় গো আমায় সেদিন শিব খায়/ যেদিন ভিক্ষা না পায় ওগো সেদিন খায় না তারে।/ কেমন করে কিনে দিব শঙ্খের মালা মোরে,/ এই কথা শুনে দুর্গা, দুর্গা কহে নীলাবতী।/ অন্নপূর্ণা দেবী সেজে এসেছিল নাকি/ দেব-দেবী বলে আজকে মা দুর্গা আই।/ এই পূজার মণ্ডপে আসে দুর্গা তোমায় চাই/ নমঃ নমঃ নমঃ দুর্গা মা গো নমঃ নারায়ণী।/ আজ বছর পরে একবার আসে দুর্গা বিপদের তারিণী/ আজকের দিনে বলে দুর্গা স্বামীকে গো তাই।/ ওগো স্বামী কিনে দাও গো শঙ্খের শাঁখা তাই,/ কেমন করে কিনব আমি আজ শঙ্খের শাখাখানি।/ আর দিন যাই গো দিন করি ভিক্ষা আমি,/ এই কথা শুনে দুর্গা বলেছিল তাই।/ তবে শঙ্খের শাখা দিতে পারে নাই বলে, দুর্গা বাপের বাড়ি যায়/ অসুর বিনাশ বধ করিতে এসেছিল দুর্গা মাগো তারি।/ নীল পাহাড় করল বধ গো অতি তাড়াতাড়ি/ বধ করে দুর্গা এসেছে পুজার মণ্ডপও তাই।/ তবে কার্ত্তিক, গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মীতে গণেশ কয়/ তবে মাকে নিয়ে দুর্গা ওগো বাবার বাড়ি যায়।/ তাই, দুর্গা গেছে বাবার বাড়ি মা দুঃখু রাজার ঘরে/ তাই নিয়ে দুর্গার ওগো বাবা কিছু বলে।/ কিসের জন্য এলি রে মা স্বামীর বাড়ি ছেড়ে তাই/ তোমার জামাই দিতে পারে নাই শঙ্খের শাখা তাই।/ ঘরে থেকে বেড়েইতে মা দুর্গার মাথায় ঠেকে চাল/ ডাইনী যার

কাল নাগিণী বায়ে ঘুরে গো শিয়াল।/ ঢেঁকি চড়ে যায় দুর্গা, দুর্গা বাবার বাড়িতে/ দুর্গার বাবা দুঃখু রাজা বলে, তাই কেনে রে মা বলে পাঠাস নাই।/ শঙ্খের শাখা কিনে দিতাম তোমায় তাই/ বাবার পরিচয় নিব না গো আজ হাতে শাখা খানি।/ স্বামীর পরিচয়ে নিব শাখা দেখিবে জননী/ এই কথা বলে দুর্গা, বাবার বাড়ি রয়।/ আর এক কাঠি বাজিয়ে নারদ মামার কাছে যায়/ কিসের জন্য ওগো মামা তুমি করো চিন্তা তারি।/ তাই, তোমার মামা কৈলাশ হৈতে বলে/ কৈলাশ ছেড়ে তোর মামি গেইছে চলে তাই।/ ওই মামিকে ওগো মামা ভাত দিও না তাই/ ওই মামিকে কৈলাশ হতে মামা জাগা দিও না গো।/ ওই মামির স্বভাব মামা ভালো নয় গো/ মামার কাছে এক কথা সে নারদ বলে দেয়।/ মামির কাছে যেয়ে নারদ আর এক কথা কয়/ কসোমামার ভাত ওগো খেয়ে নাই গো তারি।/ ওই মামা গাঁজাখোর গো ওই মামা ভিখারিণী/ ওই মামার স্বভাব মামি ভালো নয়গো তাই।/ যেখানেতে মেয়ে–ছেলে থাকে সেইখানেতে শিব মামা দাঁড়িয়ে গো যায়/ মামা-মামির ঝগড়া নারদ লাগাইগো তারে।/ আর এক কাঠি বাজিয়ে নারদ আসে মামার কাছে/ এমন বুদ্ধি দে রে নারদ, নারদ বুদ্ধি দে মোরে।/ তোর মামি কৈলাশেতে আসবে আমার ঘরে/ মা দুর্গা বাঘের পিঠে চড়ে, বোম বোম বলে মহাদেব বন্দীতে ছোটে।/ আর এক বুদ্ধি দিলো নারদ ওগো নারদ চলে যায়/ এমন বুদ্ধি দিলি ভাগ্নে বুদ্ধি নাহি খাটে।/ তোর মামি ফাঁক পেলে চাপত আমার ঘাড়ে/ যদি মামা সাজতে পারো তুমি শাখারি বরণ।/ রূপে-গুণে মামির সঙ্গে হবে দরশন/ এই কথা শুনে মাগো শিব শাখারি বরণ সেজেছে।/ আকাশ থেকে ওগো মা, জলপরিকে ডেকেছিল, শিব ভোলানাথ/ কিসের জন্য ডাকছ প্রভু আমায় তুমি তারে।/ শঙ্খের শাঁখা আন সাগর মা যে বলে/ এই কথা শুনে গরুর পক্ষী ওগো সাগরেতে যায়।/ এক ডানাতে বাঁধি সাগর এক ডেনাতে ছিঁচে/ দুটি শঙ্খ মানিক আমার শিবকে দিলো খুঁজে।/ এই নাও প্রভু শঙ্খের শাঁখা হাতে তুমি তাই/ শঙ্খের শাঁখা নিয়ে তাই শিব শাখারী সেজে যায়।/ এই শাখারি সেজে শিব শাখা বিক্রি করতে যায়/ আর মা দুর্গা যায় জল আনিতে দেখ গো সবাই তাই।/ কি শাখা এনেছো গো, আজ বলো আমার কাছে/ শঙ্খের শাঁখা এনেছি আজ নিবে নাকি তারে।/ এই কথা শুনে দুর্গা শিবকে ডেকে নিয়ে যায়/ বসতে দিলো শিব মামাকে পিঁড়েখানা তাই।/ দুর্গা বলে দেখো গো মা আজ নতুন চালির মাঝে/ রূপের খাটে গা গৌরী সোনার খাটে গা।/ শাঁখা যে পড়িছে কার্ত্তিক গণেশের মা/ এই শাখা পড়েছে গো আজ বিজয় দশমীর দিনে।/ আর শাখা পরে দুর্গা ওগো সিন্দুর খেলা করে/ সিন্দুর খেলা করে দুর্গা ওগো বিকাল বেলায় স্বামীর বাড়ি কৈলাশ চলে যায়।/ কৈলাশ দিলো মায়ের মাটি আমরা দিব কি/ আবার যেন এসো দুর্গা সামনের মণ্ডপে॥[৭]

দুর্গাপট

দুর্গা শিবের সঙ্গে ঝগড়া করে কৈলাশ থেকে পালিয়ে আসেন। কারণ তিনি নতুন শাখা কিনে দেননি। এই সুযোগে নারদ উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দিয়ে শেষে মিলনের পথ বলে দেন। তাঁরই পরামর্শে শিব শাখারির বেশ ধরে দুর্গার কাছে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের মিলন ঘটে। এই দ্বন্দ্ব মূলত সমাজজীবনের পরিচয় বহন করে। বাঙালি গৃহস্থের যে দ্বন্দ্ব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ এই পটসংগীতে ধরা পড়েছে।

করোনা ভাইরাস পট

অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এক সংক্রমক ব্যাধি করোনা ভাইরাস। এই ভাইরাসকে ঘিরে পটুয়াগণ চিত্র ও সংগীতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির দ্বারা এই রোগের উৎপত্তি, লক্ষণ, উপসর্গ ও কীভাবে এই মারণব্যাধি থেকে মুক্তি সম্ভব সেই বিষয়ে জনসাধারণকে অবগত করা ও তার যথাযথ নিয়মবিধি পালনে মানুষের ভূমিকা কেমন সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দিতে পটচিত্র উল্লেখযোগ্য এক গণমাধ্যম রূপে এখনো কাজ করে চলেছে। পটের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে ও তাকে ভবিষ্যতে এগিয়ে বা টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। হয়তো সমসাময়িক এই ঘটনাগুলোকে না ব্যাখ্যা করলে পটচিত্র লুপ্ত হয়ে যেতে পারত, কিন্তু সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে অবলম্বন করে পটচিত্র আজও সমানভাবে মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে। তাই পট ও পটুয়াদের কোনো ক্রমেই আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। এখানেই এর বিশেষত্ব লুকিয়ে আছে। একটি পটসংগীতে মারণব্যাধি করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি, উপসর্গ ও মুক্তির উপায় ধরা পড়েছে–

শোনেন শোনেন বিশ্ববাসী, ওগো শোনেন দিয়া মন।
কোভিড১৯ করোনা ভাইরাসের কথা কিছু করিব বর্ণন॥
২০২০ সালের মার্চ মাসে কোভিড১৯ করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ল গোটা বিশ্ব দরবারে।
এই রোগ এমন মারণ রোগ বাবা, মানুষে মানুষে ছড়িয়ে পড়ে অতি সত্বর॥
এই রোগ প্রথম দেখা যায় চীন দেশের হোয়াংহে।
আর অনেক মানুষ মারা গিয়েছে গো সেখানে॥
আর সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে দেশ-বিদেশে।
রাজ্যে রাজ্যে, জেলায়-জেলায়, ব্লকে এবং পঞ্চায়েতে
পাড়ায় পাড়ায় করোনা ভাইরাসে।
আর এই করোনা ভাইরাস যাতে মানুষে মানুষে ছড়িয়ে না পড়ে।
রুখতে হবে সবাই মিলে এই মহামারিকে॥
২৪শে মার্চ ঠিক রাত বারোটায় গোটা দেশ লকডাউন করে দিলো॥
আকাশপথ-রেলপথ-পরিবহণপথ, স্কুল দোকানবাজার সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল।
জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট, গাব্যথা হলে ডাক্তারখানা যেতে হবে ভাই।
দূরত্ব বজায় রাখিতে হবে তা জানায়।[৮]

করোনা ভাইরাসপট

পটশিল্প শুধু বাংলার উল্লেখযোগ্য লোকশিল্প নয়, একইসঙ্গে দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে সারা বিশ্বে এর জনপ্রিয়তা লক্ষিত হতে দেখা গেছে। ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে আদান-প্রদানের মাধ্যমে সুষ্ঠু সংস্কৃতিকে বজায় রাখা সেই বাস্তব সত্যকেই পটশিল্প ও সংগীতের মাধ্যমে তুলে ধরে। এই পটুয়া সম্প্রদায়গণ নানা ধর্মীয়, পৌরাণিক, সমসাময়িক ঘটনাবলি অবলম্বন করে ছবি এঁকে ও গান শুনিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সামান্য কিছু অর্থ উপার্জন করেন মাত্র। পটুয়াদের জীবনাচরণ এক মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয়বাহী। মূলত নীতি, সংস্কার, নান্দনিক বিকাশ সমস্ত উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে পটশিল্প ও পটুয়াসংগীত সাংস্কৃতিক ও সমন্বয় ভাবনার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। আবহমান কাল ধরে এই শিল্প বা সংস্কৃতি মানবহৃদয়ে চিরন্তনত্বের দাবি রাখে। তবে উপযুক্ত সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার কারণে এই শিল্প ক্রমশ অবলুপ্তির পথকে প্রশস্ত করে তুলেছে। তাই সময় এসেছে বিষয়টি নিয়ে ভাববার ও সেদিকে হস্তক্ষেপ করবার–এই আশাবাদ পটুয়াদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শোনা যায় বারবার। •

সূত্রনির্দেশ

১) মান্না সুব্রত কুমার : 'বাংলার পটচিত্র, পটুয়াসংগীত, পটুয়াসমাজ ও লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান', ফার্মা কে.এল.এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-২০১২, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১২, পৃ.-৪২
২) মান্না সুব্রত কুমার : 'বাংলার পটচিত্র, পটুয়াসংগীত, পটুয়াসমাজ ও লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান, ফার্মা কে.এল.এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-২০১২, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১২, পৃ.-৪৩
৩) মুখোপাধ্যায় আদিত্য : 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', 'পট ও পটুয়া' প্রবন্ধ, অমর ভারতী, ২০০৫, পৃ.-৯৭
৪) দত্ত গুরুসদয় : 'পটুয়া সঙ্গীত', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৯৩, পৃ.-১৮
৫) সাক্ষাৎকার : হয়রান পটুয়া, লিঙ্গ-পুং, বয়স-৫০, গ্রাম-দাঁড়কা, থানা-লাভপুর, জেলা-বীরভূম, তথ্যসংগ্রহের তারিখ-২৯ জুন, ২০২০
৬) সাক্ষাৎকার : পূর্বোক্ত ব্যক্তি
৭) সাক্ষাৎকার : লাণ্টু পটুয়া, লিঙ্গ-পুং, বয়স-৬০, গ্রাম-ইটাগড়িয়া, থানা-সিউড়ি, জেলা-বীরভূম, তথ্যসংগ্রহের তারিখ-২৪ অক্টোবর, ২০২০
৮) সাক্ষাৎকার : পূর্বোক্ত ব্যক্তি

সেখ একরামুল হোসেন
পিএইচ.ডি. গবেষক
লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

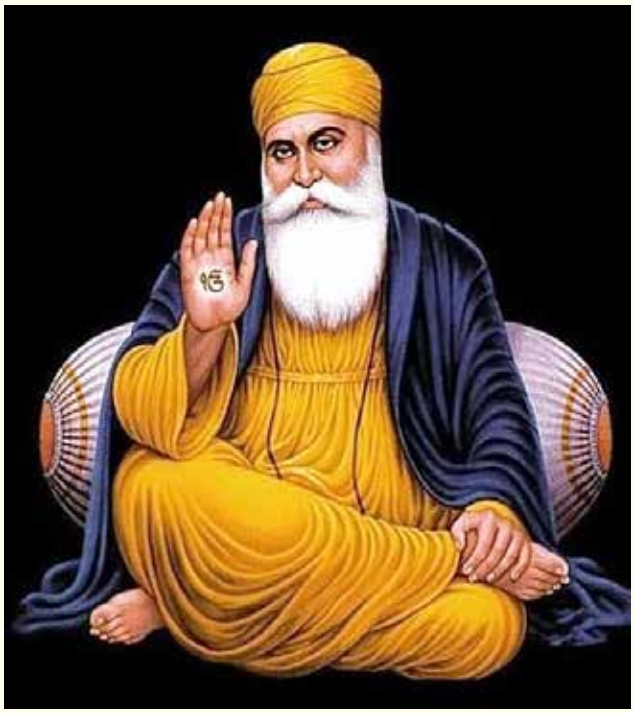

শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা
ধর্মগুরু নানক

সাদী মোহাম্মদ

ভারতীয় উপমহাদেশের একেশ্বরবাদ ও অধ্যাত্মবাদের পুরোধা ব্যক্তি গুরু নানক। ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সবার উপরে মানুষ সত্য এই মর্মবাণী হৃদয়ে, বাণীতে ও তার প্রচারিত ধর্মে স্পষ্ট করেছেন। 'যিনি সব মানুষকে এক বলে বিবেচনা করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক।' সুফিবাদের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অহংকার, লোভ, কাম, ক্রোধ, মোহ থেকে মুক্ত হয়ে দান ও পরার্থপরতাই মহৎ ধর্ম হিসেবে মানবতার জয়গান করেন গুরু নানক। এ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম ধর্ম হিসেবে। তিনি শিখ ধর্মের প্রথম ধর্মীয় গুরু এবং প্রবর্তক।

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত লাহোরের রায় ভর দি তালবন্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন গুরু নানক। বাবা মেহতা কল্যাণ দাস বেদী ও মা তৃপ্তা দেবী। ছেলেবেলা থেকেই মুক্তবুদ্ধির চর্চা, যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সবকিছু প্রমাণ করে বিশ্বাস ও গ্রহণের মানসিকতা পরিলক্ষিত হয় গুরু নানকের মধ্যে। মাত্র এগারো বছর বয়সে উপনয়ন দিতে গেলে তিনি পৈতা নিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'ব্যক্তি বিচার করে জাতের বিচার করা উচিত নয়'। ঈশ্বরের স্বরূপ ও প্রকৃত ধর্মানুশীলন নিয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে বিতর্ক করতেন।

ব্যক্তিজীবনে খুব বেশি পড়াশোনা করেননি গুরু নানক। গান লেখার প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। স্থানীয় জমিদার বাড়িতে কেরানির কাজ করতেন। বিয়ে করে দুই সন্তানের জনক হন। পরিবারের মায়া ত্যাগ করে প্রকৃত সত্যের সন্ধানে বের হয়ে একসময় ঈশ্বরের স্বরূপ অনুধাবন করতে সমর্থ এবং ঈশ্বরের বাণী প্রচারে একনিষ্ঠ হন। তিনি প্রচার করেন, 'ঈশ্বর কেবল একজনই, তিনিই সত্য, তিনিই স্রষ্টা, তাঁর ভয় নেই, তাঁর ঘৃণা নেই, তিনি কখনো বিলীন হন না, তিনি জন্ম-মৃত্যু চক্রের ঊর্ধ্বে, তিনি অজ-অমর স্বয়ংপ্রকাশ। সাধনার দ্বারা প্রকৃত গুরুর মাধ্যমেই তাঁকে অনুধাবন করা যায়। তিনি আদিতে সত্য ছিলেন, তিনি কালের সূচনায় সত্য ছিলেন, চিরকালব্যাপী সত্য আছেন এবং তিনি এখনো সত্য।' গোড়ামিকে বাদ দিয়ে ধর্ম ও দর্শনভিত্তিক প্রগতিশীলতার চর্চার দিকে ধর্মকে ধাবিত করেন গুরু নানক। তিনি বলতেন, ঈশ্বর ন্যায়পথ অনুসরণ করেন। ঈশ্বর সব ধরনের ধর্মীয় মতবাদের ঊর্ধ্বে। সর্বব্যাপ্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল গুরু নানকের। যিনি নিরাকার। এক। যিনি তার সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান।

সুফিবাদের থেকে জীবনের নানা দর্শন, ব্রহ্মবাদতত্ত্বসহ বিভিন্ন ধর্মের মিশ্রণে নিজস্ব চিন্তা চেতনায় গড়ে তোলেন নিজস্ব মতবাদ। পৃথিবীতে গড়ে ওঠা প্রাচীন সনাতনী থেকে, মৌলিক ধর্মসমূহের থেকে নিজের সরল, যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে অধ্যাত্মবাদের আত্মিক দর্শনে গড়ে তোলেন শিখধর্ম। সমতা, ভ্রাতৃত্ব, দান, দর্শন, ধ্যান ও সদাচরণের বিভিন্ন ভিত্তির ওপর ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা হলো শিখধর্ম। শিখধর্ম মূলত গুরুমুখি ধর্ম। ঐতিহাসিকভাবে প্রচলিত আছে বাহলুল দানা (in) এর শিষ্য হিসেবে দীর্ঘ সাহচর্য পেয়েছিলেন নানক। শিখ অর্থ শিষ্য। শিখরা দশজন গুরুর আদর্শ ও শিক্ষাকে অনুসরণ করে। গুরু নানক এদের মধ্যে প্রথম গুরু। *গ্রন্থসাহেব* এ ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ। প্রথম পঞ্চগুরুর শিক্ষা, ধর্মীয় মতাদর্শ ও চিন্তাচেতনা নিয়ে রচিত *গ্রন্থসাহেব*। এই গ্রন্থে অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের বাণী শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করার মধ্যে শিখদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রমাণ পাওয়া যায়। শিখরা জাত, বর্ণ, ভেদাভেদ মানেন না। একস্থানে, একসঙ্গে বসে সবাই আহার করেন।

পর্যটনপ্রিয় গুরু নানক তাঁর বন্ধু মর্দানাকে নিয়ে পদব্রজে পৃথিবীর নানাপ্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন। জাত, ধর্ম, বর্ণের ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে এই পরিভ্রমণের মাধ্যমে অর্জন করেছেন বাস্তব জ্ঞান। নানা অঞ্চল, বর্ণ, ভিন্ন ভাষার মানুষ ও প্রকৃতি একসময় তাঁর মধ্যে উপলব্ধি এনে দিয়েছে যে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ অর্থহীন। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সদাচারণই প্রকৃত মানবধর্ম। তাই তিনি তাঁর প্রচারিত ধর্মে বাহ্যিক ধর্মের নিয়মরীতি যেমন নামাজ বা মূর্তিপূজাকে বাদ দিয়ে ধর্মের অভ্যন্তরীণ অধ্যাত্মবাদের চর্চা করেছেন এবং তিনটি বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। পরার্থপরতা, সৎ উপায়ে উপার্জন ও ঈশ্বরের নাম জপ। গুরু নানকের শিক্ষায় যথাযথ সামাজিক সংশ্লেষণ ছিল। বর্ণবাদ ও পুরোহিতদের ধর্মীয় অপব্যাখ্যা নিয়ে সোচ্চার ছিলেন। তাকে নিয়ে প্রচলিত আছে যে বাইন নদীতে গোসল করতে গিয়ে নদী পাড় বা নদীতে ডুব দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কয়েকদিন পর ফিরে এসে বলেন যে তিনি ঈশ্বরের দেখা পেয়েছেন। এবং ঈশ্বরের বাণী প্রচারের জন্য তিনি মানুষের কাছে ফিরে এসেছেন।

শিখধর্ম আত্মপ্রকাশ করে গুরু নানকের নিজস্ব জন্মশহর পাঞ্জাবে এবং এই অঞ্চলে বিকাশ লাভ করে। এরপর ধীরে ধীরে পৃথিবীর নানা প্রান্তে এই ধর্মের মূলবাণী পৌঁছে গেছে। গুরু নানকের জীবদ্দশায় হিন্দু, মুসলমান, আদিবাসীসহ অনেক জাতি ও ধর্মের মানুষ শিখ ধর্মের মূল বাণীকে ধারণ করেছেন তাদের প্রাত্যহিক জীবনে। গুরু নানক কখনো ভক্তের দেওয়া পার্থিব উপহার গ্রহণ করতেন না। আধ্যাত্মিকতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্তর্জাগরণ ও আত্মিক অনুভবের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন গুরু নানক।

গুরু নানক সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি বাংলাদেশের দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির, সিলেট, চট্টগ্রামের চকবাজার এবং ঢাকায় এসেছেন বলে জানা যায়। যদিও মাত্র চট্টগ্রামের চকবাজারে আসার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এইসব ভ্রমণকালে ধর্মমত প্রচারের জন্য মাঞ্জি বা আধ্যাত্মিক আলোচনার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এমন একটি মাঞ্জি হলো ঢাকা শহরের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত গুরুদুয়ারা নানকশাহী উপাসনালয়। এখানে সকাল, সন্ধ্যা *গ্রন্থসাহেব* পাঠ ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার দুপুরে লঙ্গরখানায় খাবার পরিবেশন করা হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে।

গুরু নানক ১৪৬৯ সালে কার্তিক পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেন। তাই প্রতিবছর নভেম্বর মাসে কার্তিক পূর্ণিমায় মহাধুমধামে পালিত হয় গুরু নানক জন্মজয়ন্তী। গুরু নানক জয়ন্তী শিখধর্মের অনুসারীদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। একে প্রকাশ উৎসব ও গুরুপর্ব বলা হয়।

জীবনের শেষ দিকে পাঞ্জাবে স্থায়ী হন গুরু নানক। দেহযাত্রা নিয়ে রয়েছে ভিন্নমত। ১৫৩৯ সালের ৭ মে পাঞ্জাবের করতারপুর নামক স্থানে গুরু নানক নিরুদ্দেশ হন। কেউ কেউ বলেন তিনি নদীতে ডুবে দেহযাত্রা করেছেন। •

সাদী মোহাম্মদ ॥ কবি ও কথাসাহিত্যিক

ভারতীয় হাইকমিশন, ঢাকা আইটেক অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএএবি)-এর সঙ্গে ৭ নভেম্বর, ২০২৩-এ ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন (আইটেক) দিবস উদ্‌যাপনের জন্য একটি সংবর্ধনা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটির আয়োজক মাননীয় ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী প্রণয় ভার্মা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি।

মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি

ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, এনই (কে), ১৪, ১৮০, গুলশান অ্যাভেনিউ, ঢাকা

Regd. No. DA 355, Bharat Bichitra, November, 2023

ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং লাইব্রেরি
হাউজ নং : ২৪, রোড নং : ০২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
টেলিফোন : +৮৮০২৯৬১২৩২২, ইমেইল : lib.dhaka@mea.gov.in

লাইব্রেরি সময় : রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার ॥ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫.৩০ মিনিট

লাইব্রেরি মেম্বারশিপ ফরম : www.hcidhaka.gov.in/pdf/membershipapplicationform-292018.pdf

ভারতীয় ভিসা আবেদনকারীদের জন্য জ্ঞাতব্য

ভারতীয় হাই কমিশন ও ভিসা আবেদন কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো এজেন্টের সম্পর্ক নেই।
ভারতীয় হাই কমিশন বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে কোনো ভিসা ফি নেয় না।
ভিসা আবেদন কেন্দ্র ভিসা প্রসেসিং ফি হিসেবে মাত্র ৮০০ টাকা নিয়ে থাকে।

আবেদন করার আগে দয়া করে এই তথ্যগুলো সম্পর্কে সচেতন হোন।